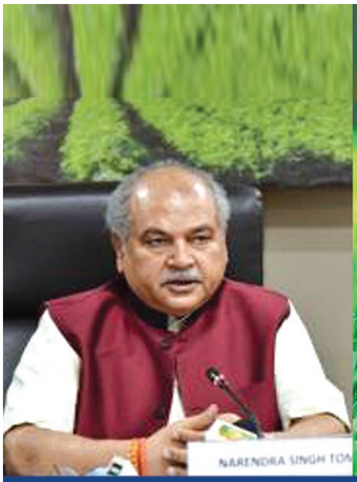

দাম : পঁচিশ টাকা

স্বস্তিকা

৭৩ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ৮ মার্চ ২০২১।। ২৩ ফাল্গুন - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২
পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা

৭৩ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ২৩ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৮ মার্চ - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ

নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ

নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ২৫ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration
No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ■ ৫

কৃষি আইন রূপায়িত হলে বাঙ্গালি কৃষক প্রকৃত কৃষক হবে ■ কল্যাণ চক্রবর্তী ■ ৬

বঙ্গ সংস্কৃতি কোথায় নেমেছে মুখ্যমন্ত্রীর শব্দ ব্যবহারে সেটি স্পষ্ট ■ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ■ ৯

মমতা কি সিপিএমের ‘মেধাবী ছাত্রী’? ■ তথাগত রায় ■ ১১

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ হোক ■ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ■ ১২

স্বাস্থ্যসাথী বেসরকারী হাসপাতালের দিকে আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা ■ বিশ্বপ্রিয় দাস ■ ১৩

চার দশকে ভেঙে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি ■ দীপ্তাস্য যশ ■ ১৪

অপরাধপ্রবণ রাজ্য হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ ■ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ■ ১৬

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রগতির অন্তরায় ■ ড. শুভদীপ গাঙ্গুলী ■ ১৮

শাসক পালটালেও এরাজ্যে নৃশংসতার ট্রাডিশন চলতেই থাকে ■ হীরক কর ■ ১৯

আল-কায়দাও পৌঁছে গেল, মুখ্যমন্ত্রী এবার মুখোশটা খুলুন ■ নিবারণ রায় ■ ২৩

কৃষিবিল, কৃষক আন্দোলন— বাস্তবতা বনাম ষড়যন্ত্র ■ কল্যাণ গৌতম ■ ২৭

কৃষক আন্দোলনে বামপন্থীদের সমর্থন বাস্তুঘুঘুদের হয়ে ওকালতি ■ ড. সৌমেন ঘোষ ■ ২৯

ভারতের শিক্ষানীতি ২০২০, উন্নত ভারতের দিক্‌নির্দেশ ■ রবিরঞ্জন সেন ■ ৩৩

মগজ ধোলাইয়ে মৃতপ্রায় বাঙ্গালিকে অক্সিজেন জোগাবে জাতীয় শিক্ষানীতি ■ ড. তরুণ মজুমদার ■ ৩৭

শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের অপেক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ ■ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ■ ৩৯

শাসকের মদতে পশ্চিমবঙ্গে গোরুপাচারের বাড়বাড়ন্ত ■ তরুণকুমার পণ্ডিত ■ ৪১

আলকায়দা জঙ্গি, গোরু ও কয়লা মাফিয়াচক্রের শেকড় নবান্ন পর্যন্ত বিস্তৃত নয় তো? ■ সাধন কুমার পাল ■ ৪৩

পশ্চিমবঙ্গে কেন পরিবর্তন চাই ■ বিনয়ভূষণ দাশ ■ ৪৭

বিজেপির লক্ষ্য সোনার বাঙ্গলা ■ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ■ ৫১

করোনা অতিমারীর মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকা বিশ্বসেরা ■ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ■ ৫৩

কেন্দ্রীয় বাজেটে সড়ক পরিকাঠামোয় ব্যয়বরাদ্দ রাজ্যের উন্নয়নের সহায়ক ■ অম্লানকুসুম ঘোষ ■ ৫৫

উন্নয়নের কাণ্ডারি নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী ■ সুজিত রায় ■ ৫৬

মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবার কথা বিজেপি ছাড়া আর কেউ ভাবেনি ■ লাইলাক বিশ্বাস ■ ৫৯

বিদ্যুতায়নেও বিপ্লব ঘটিয়েছে মোদী সরকার ■ শেখর সেনগুপ্ত ■ ৬১

বঙ্গ সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রধান কারিগর বামেরা ■ অভিমন্যু গুহ ■ ৬৪

বঞ্চনা থেকেই প্রাথমিক শিক্ষকরা পথে নেমেছেন ■ জাহ্নবী রায় ■ ৬৫

প্রকাশিত হবে
১৫ মার্চ
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৫ মার্চ
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কেন পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় ভোট

নির্বাচন কমিশন দেশের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় ভোট নেওয়া হবে জানা মাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গে দফায় দফায় ভোট গ্রহণের ঘটনা নতুন নয়। তাহলে হঠাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত ক্ষিপ্ত হলেন কেন? উনি যখন বিরোধীপক্ষে ছিলেন তখন তিনিও তো পশ্চিমবঙ্গে কয়েকদফায় ভোট গ্রহণের পক্ষে নির্বাচন কমিশনের কাছে সওয়াল করেছিলেন। তাহলে এখন অসুবিধাটা কোথায়?

আগামী সংখ্যার স্বস্তিকায় অনুসন্ধান করা চেষ্টা হবে আট দফায় ভোটের কারণগুলি।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani**
Kolkata-700 071

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতমাতার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গমাতাও খণ্ডিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গ হইয়াছিল।। সেই পশ্চিমবঙ্গ মাত্র বিশ বৎসরেই রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের অপশাসনের শিকার হইল। তাহাদের প্রথম হাত পড়িল কৃষিতে। ১৯৬৭ হইতে ১৯৭১ পর্যন্ত জমিদখল, খুনখারাপি ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে ভীতির পরিবেশ তাহারা নির্মাণ করিল। ওই সময় কেন্দ্রে কংগ্রেসদল ভাগ হইয়া ইন্দিরা কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজনীতিতে ব্যক্তিপ্রভাব বৃদ্ধি পাইতে শুরু করিল। ইতিমধ্যে আর এক অতিবাম শক্তি সিপিআই(এমএল) সৃষ্টি হইয়া কৃষক ও ছাত্রসমাজে ব্যাপক ত্রাস সৃষ্টি করিল। ১৯৭১ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার ইহাদের কিছুটা দমন করিলেও তিন বৎসর পরে কেন্দ্রের ইন্দিরা সরকারের জারি করা জরুরি অবস্থা সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরও সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করিল। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সারা দেশে বিরোধী মঞ্চ তৈরি করিয়া পশ্চিমবঙ্গেও গণতন্ত্র রক্ষার্থে সত্যাগ্রহ শুরু হইল। ১৯৭৭ সালে এক নূতন দল জনতা পার্টি গঠন করিয়া নির্বাচন সংঘটিত হইল। নির্বাচনে স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধীর পতন হইল। কেন্দ্রে জনতা সরকার থাকিলেও পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হইল। অনতিকাল পরেই তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ পাইল। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসরে তাহারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষির দফারফা করিয়া রাজ্যটিকে সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলিল। এইরূপ অবস্থা হইতে রাজ্যের মানুষ মুক্তি পাইবার আশায় ২০১১ সালে পালাবদল ঘটাইয়া মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠিত করিল। আবার রাজ্যবাসীর মোহভঙ্গ ঘটিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সবাই বুঝিতে পারিলেন যে, ডাকাত তাড়াইড়া আরও দুর্ধর্ষ ডাকাতকে তাহারা আনিয়াছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। বামেদের চাইতেও বর্তমান তৃণমূল সরকার অপশাসন, কুশাসন এবং জেহাদি শক্তির বাড়বাড়ন্ত ঘটাইয়া রাজ্যটিকে সর্বনাশের দোরগোড়ায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ইহাতে রাজ্যের মানুষের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে? এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ কী? এই অরাজকতা কি চলিতেই থাকিবে? ইহা হইতে কি পরিত্রাণের পথ নাই?

আশার কথা, অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের মানুষও গণতন্ত্রপ্রিয়। স্বৈরাচারী শাসককে তাহারা কোনোদিন মানিয়া লন নাই। শত অত্যাচারেও তাহারা মাথা নত করেন নাই। বড়ো আশা করিয়া বাম অপশাসনকে বিদায় জানাইয়া যে সরকারকে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, অচিরেই তাহাতে মোহভঙ্গ হইয়া যায়।বর্তমান শাসকদল পশ্চিমবঙ্গে এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সর্বপ্রকারের অপশাসনে রাজ্যবাসীর নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। স্বভাবতই সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-যুব সমাজ জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হইয়া এই অত্যাচারের অবসানকল্পে রাস্তায় নামিয়াছে। রাজ্যে জাতীয়তার আবহে এক নূতন রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নিশ্চয় তাহার প্রতিফলন ঘটিবে আশা করা যায়। রাষ্ট্রীয় মনোভাবাপন্ন কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির সুশাসন বঙ্গবাসী প্রত্যক্ষ করিতেছে। সেই সুশাসনের লাভ হইতে তাহারা আর বঞ্চিত থাকিতে চাহেন না। পশ্চিমবঙ্গের জনমানস এক নূতন সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

সুভাষিতম্

সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্মলং নয়নদ্বয়ম্।

যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধ কথং ন স্যাদ্‌মার্গগঃ।।

সৎসঙ্গ ও বিবেক — এই দুটি মানুয়ের নির্মল চক্ষুস্বরূপ। এইদুটি যার নেই তার বিপথগামিতা কে রোধ করবে?

কৃষি আইন রূপায়িত হলে বাঙ্গালি কৃষক প্রকৃত কৃষক হবেন

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

রাজ্যের ৯৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাদ্য উৎপাদন করলেও, তাদের গড়পড়তা বার্ষিক আয় মোটে আটচল্লিশ হাজার টাকা। ভারতীয় কৃষকের গড় আয় আটাত্তর হাজার টাকা। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের আয় ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের চাইতেও কম। রাজ্যে ফসল কাটার পর ব্যবস্থাপনার বিস্তর অভাব আছে, বিপণনের পরিকাঠামোগত সুযোগ নগণ্য। কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব হবে, যদি নতুন কৃষি আইন দ্রুত চালু করে ফসলের সুনিশ্চিত দাম পাইয়ে দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে রাজ্যের কৃষি ও আনুষঙ্গিক বিভাগগুলিকে সুষ্ঠু ও সমন্বিতভাবে কাজ করানো যায়। ফসল-প্রাণীসম্পদ-মৎস্য ভিত্তিক চিরায়ত কৃষিকর্মের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। হাজার হাজার ফার্মারস প্রোডিউসিং অর্গানাইজেশন তৈরি হলে কৃষকদের একত্রিত করে ফসলের দাম পেতে দর কষাকষি সম্ভব হবে। এফপিও তৈরি করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সেই কাজটিই করতে চলেছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য মোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন তখনই হবে, যখন ফসলের বাজার তৈরি করা যাবে, ফসলের দাম পাওয়ার ব্যবস্থা হবে, ফসল লাগানোর সময়েই চুক্তিচাষে নিশ্চিত হওয়া যাবে কতটা মূল্য সে পেতে পারে। নতুন কৃষি আইনে যে সুযোগ রয়েছে।

এখন প্রশ্ন, কেউ কেউ কৃষি আইনের বিরোধিতা করছেন। কেন? কেনই বা অনেকে বলছেন, কৃষি বিল এই রাজ্যের চাষির জন্য আশীর্বাদ? আসলে বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে দুটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর, তিনি কৃষকের স্বার্থ দেখছেন, না মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থের কথা ভাবছেন। কৃষকের জন্য তার মায়াকান্না, না কি দালালদের জন্য তার প্রেম? তিনি কি ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষির কথা ভাবছেন, না কি জোতদার শ্রেণির কৃষকের কথা ভাবছেন। তিনি দুই-এক বিঘা জমির মালিক এমন কৃষকের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলেন, না কি যার জমির পরিমাণ কয়েকশো বিঘা, তার উপরেই কৃপাদৃষ্টি রেখেছেন। যদি পশ্চিমবঙ্গের মতো হতদরিদ্র চাষির কথা না ভেবে কোনো রাজনৈতিক দল পশ্চিম ভারতের জোতদার শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বিরোধিতা করার মোক্ষম সুযোগ খোঁজেন, তবে বলতে হবে পশ্চিমবঙ্গে জোতদার জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে ভূমি সংস্কারের চিন্তাভাবনা একেবারেই ঐতিহাসিক ভুল ছিল। কৃষি আইনের বিরোধিতা করতে হলেও এই আইনগুলি খুঁটিয়ে পড়তে হবে। নইলে মিথ্যার বেসাতি বন্ধ হবে না। অনেকে আইনগুলি আংশিক পড়েও অসংখ্য মিথ্যা বলতে পারেন। তার সম্পর্কে যে প্রবাদ বাক্যটি অনুসরণ করা যায়, তা হল, "সে কহে অধিক মিছে যে কহে বিস্তর।"

এই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার আগে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকসমাজের পরিচয় গ্রহণ করে নেওয়া যাক। এ রাজ্যের বড়ো অংশের মানুষের জীবনপথ হচ্ছে কৃষিকর্ম। খাদ্যোৎপাদন ও জীবনচর্যায় কৃষিই তাদের আশা, চাষাবাদই তাদের ভরসা। জমির মালিকানা আছে এমন কৃষককের পাশাপাশি হাজার হাজার ভূমিহীনশ্রমিকও কৃষিকাজকে জীবন ও জীবিকার জন্য বেছে নিয়েছেন। রাজ্যে জমির পরিমাণ এক হেক্টর বা সাড়ে সাত বিঘার কম এমন কৃষক রয়েছেন ৮২.১৬ শতাংশ, যাদের বলা হচ্ছে প্রান্তিক চাষি। ৫২.৪৭ শতাংশ ব্যবহারযোগ্য জমি-জিরেতের মালিকানা তাদেরই হাতে। ১৩.৭৬ শতাংশ কৃষক মোটের উপর ক্ষুদ্রচাষি। তাদের মাথাপিছু জমির গড় পরিমাণ এক থেকে দুই হেক্টর। এরা রাজ্যের মোট চাষযোগ্য কৃষিজমির ২৮.২৫ শতাংশ দখল করে আছে। সবমিলিয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ৯৫.৯২

শতাংশ, তারা মোট ৮১ শতাংশ কৃষিজমির মালিক। ২০১০-১১ সালের জনগণনা অনুসারে ৭২ লক্ষ কৃষক পরিবার এ রাজ্যে বসবাস করেন। ধীরে ধীরে তাদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমছে এবং চাষ থেকে আয়ের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। রাজ্যের শস্য নিবিড়তা ১৮৫ শতাংশ। অর্থাৎ রাজ্যে গড়পড়তায় দুটি ফসলও চাষ হয় না। সেচের সুবিধাযুক্ত কৃষিভূমি মাত্র ৫৪ শতাংশ। রাজ্যের একটি বড় এলাকা খরাপ্রবণ পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত। সেখানে ভূমিক্ষয় বড় সমস্যা। মাটির উর্বরাশক্তি একেবারেই কম। বৃষ্টিপাত কম ও অনিশ্চিত। এদিকে সুন্দরবন একটি পশ্চাৎপদ ব-দ্বীপ এলাকা। সেখানে সতেজ ও বিশুদ্ধ জলে সেচ দেওয়া মুশকিল। পার্বত্য ও তরাই অঞ্চলের মাটি ক্ষয়িষ্ণু এবং অম্লধর্মী। তার উৎপাদিকা শক্তি কম। সেচের সুবিধা অপ্রতুল। ফলে এইসব অঞ্চলে প্রতিকূলতার জন্য দশকের পর দশক কৃষিকাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

কৃষিপণ্যের বাজার এবং বাজারের যাবতীয় প্রণালীর প্রতি রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের সংঘটিত ও পরিকল্পিত ভূমিকা নেই। তার ফলে কৃষিতে প্রত্যাবর্তন কম, কৃষকের আয় বেশি নয়। বাজারের সুযোগ গড়ে ওঠেনি বলেই গ্রীষ্মের মাসগুলিতে ঢেঁড়সের পাইকারি দর কেজিতে মাত্র দু টাকা দাঁড়ায়, শীতের সময় ফুলকপি এক টাকা। এই দামে বেচলে কৃষকের দুঃখ কখনো ঘুচবে না। এই দাম পেলে ফসল তোলার খরচও উঠবে না। ধান গম আলু আনাজের মতো ফসলে বিঘা প্রতি খরচ দশ-বিশ হাজার টাকা। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় তা শেষ হয়ে গেলে কয়েক মাস বাদে কৃষকের হাত শূন্য হয়ে যায়। আর ফলন ভালো হলেও রক্ষা নেই, কৃষকের কপাল পোড়ে, ফড়ের পোয়া বাড়ে। এদিকে রাসায়নিক চাষে খরচ বেশি। সার, কীটনাশক, আগাছানাশকের খরচ, সবকিছু ধরতে হবে। উচ্চফলনশীল জাতের বীজ কেনার খরচ আছে। কিন্তু যদি ফলনের কথা চিন্তা করি, তবে প্রাথমিকভাবে উচ্চফলন দিলেও, সবমিলিয়ে চাষের লাভজনক আয় চাষিকে দিতে সক্ষম হবে না। রাসায়নিক চাষের ফলে মাটির অণুজীবের সংখ্যা সাংঘাতিকভাবে কমে যায়, মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। জল, বায়ু দূষিত হয়। স্বাস্থ্যসঙ্কট দেখা দেয়, মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। সবমিলিয়ে কৃষক দীনদরিদ্র হয়ে পড়ে।

এই রকম একটি পরিমণ্ডলে গত সেপ্টেম্বর মাসে কৃষি বিষয়ক তিনটি বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় পেশ ও উত্তীর্ণ হয়ে, ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে আইনরূপে বলবৎ হয়েছে। আইনগুলি হচ্ছে—১. কৃষি পণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য (উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতি) আইন বা FPTC Act; ২. কৃষক (ক্ষমতায়ন ও রক্ষা) মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি পরিষেবা আইন বা FAPAF Act; এবং ৩. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইন বা ECA Act। এই আইনগুলির ফলে বাজারের প্রথাগত প্রাঙ্গণের বাইরে বাধাহীন হবে অন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য। কৃষকদের সরাসরি বিপণনে জড়িত হতে সাহায্য করবে এই আইন, মধ্যস্থতাকারীদের অবস্থানও দূর করবে। এই আইন ভারতের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় এক ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে পরিকাঠামোগত বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রবল হবে। গ্রামে গ্রামে কোল্ড স্টোরেজ, গুদামঘর ইত্যাদি তৈরি হবে এরই ফলশ্রুতিতে। আর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এপিএমসিগুলি বা Agricultural Produce Market Committee গুলি কৃষকদের আরও সুবিধার বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হবে।

কৃষিপণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য আইনে এমন একটি তন্ত্র রচনার বন্দোবস্ত হয়েছে যেখানে কৃষক ও ব্যবসায়ী কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় স্বাধীনতা ভোগ করবেন, আগে যেটা ছিল না। মান্ডিতে ফসল বিক্রি করতে গিয়ে যদি কৃষক মনে করেন তিনি প্রতারিত হচ্ছেন,

যথাযথ দাম পাচ্ছেন না, তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা তার জন্য খুলে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতার এক নতুন ও অন্যতর মার্কেটিং তৈরি হচ্ছে। দক্ষ, স্বচ্ছ ও বাধাহীন এই প্রণালী। কৃষিপণ্যের অন্তঃরাজ্য ও আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য সম্ভব হবে। দৃশ্যমান বাজারের বাইরে বাজার-সদৃশ স্থল রচনা হবে। সম্ভব হবে বৈদ্যুতিন বাণিজ্য। আইনের মূল লক্ষ্যটি হল, সারা দেশের জন্য সুসংহত ও অভিন্ন একটি বাজার গড়ে তোলা—'এক দেশ এক হাট'। কেন্দ্র সরকার চাইছেন না, কৃষক ও সাধারণ ক্রেতার মধ্যে কাটমানিখোর মধ্যস্বত্বভোগীরা এঁটুলিপোকার মতো লাভের গুড় খেয়ে যাক। নতুন আইনে কৃষক ফসল থেকে বেশি দাম পাবেন, লাভবান হবেন। তেমনই সাধারণ মানুষ তুলনায় কমদামে ফসল কিনতে পেরে লাভবান হবেন। অর্থাৎ এটি যেমন কৃষক-বান্ধব আইন, তেমনই আম-জনতার সহায়ক আইন। তবে দালালদের সন্তুষ্টির আইন এটি নয়। কৃষিতে লাভ হয় না বলে, যে কৃষক চাষ ছেড়ে দিচ্ছেন; তার বিপ্রতীপে এই আইন কৃষককে জমি-জিরেতের অভিমুখী করে তুলবে। মান্ডিতে বিক্রি করার জন্য যে শুল্ক লাগত, এখন থেকে তা আর লাগবে না। কেউ যদি মনে করেন, তিনি লেভি দিয়ে মান্ডিতেই ফসল বিক্রি করবেন, তার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ যারা বলছেন, মান্ডি উঠে যাচ্ছে, তা কিন্তু নয়।

দ্বিতীয়ত, কৃষি সুরক্ষা আইন হল চাষের চুক্তি সংক্রান্ত একটি জাতীয় ফ্রেমওয়ার্ক। কৃষককে ক্ষমতাশালী করাই তার লক্ষ্য। কৃষি এক শিল্পের পর্যায়ে যাচ্ছে, একটি ভৌমশিল্প যেন। এখন থেকে ব্যবসায় জড়িত হবেন কৃষক। জড়িত হবেন ব্যবসায়ী ফার্মের সঙ্গে, প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির সঙ্গে, পাইকারি বিক্রেতার সঙ্গে, কিংবা খুচরো ব্যবসায়ীর সঙ্গে। বীজ বোনার আগেই চুক্তি হতে পারে, কিন্তু চুক্তির এক্তিয়ারটি আসছে ফসল পাকার পর, কেবলমাত্র উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য। এটি আদৌ জমির বন্ধক সংক্রান্ত কোনো চুক্তি নয়। কখনই জমি হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা নেই। একেবারে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন একটি পদ্ধতির কথা আছে। কৃষকের লাভজনক দাম পাবার কথা আছে। চাষের শুরুতেই কৃষক লাভের ব্যাপারে স্থিরচিত্ত হতে পারবেন এই আইনে।

তৃতীয়, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইনে বলা হয়েছে যে কেন্দ্র সরকার কেবলমাত্র যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতি তৈরি হলে তবেই খাদ্যশস্য, ডালশস্য, আলু, তৈলবীজ ও পেঁয়াজের মতো কৃষিপণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করবে। পচনশীল ও অপচনশীল উদ্যান ফসলের দাম কত শতাংশ বৃদ্ধি পেলে সরকার মজুতদারি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কীভাবে তা করবে, তা সুস্পষ্ট বলা আছে এই আইনে। কোনোভাবেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বেলাগাম আইন এটি নয়। সিমেন্ট, ইস্পাতও পূর্বে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের আওতার বাইরে চলে এসেছে, তাতে মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে কিন্তু ইস্পাত ও সিমেন্ট যায়নি। ১৯৫৫ সালে যখন এই আইন চালু হয় তখন আজকের মতো কৃষি উন্নয়নের পরিস্থিতি ছিল না। আজ দেশে কৃষি উৎপাদন ও তার হার অনেক বেড়েছে। দেশ আজ কৃষিতে স্বাবলম্বী। তাই ৬৫ বছর আগেকার কৃষিনীতি আজকের নীতি হতে পারে না। এই আইনের সংশোধনী সম্পর্কে সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স শ্রীমতী লীনা নন্দন জানিয়েছিলেন, "Essential Commodities Act was conceptualised in the era of food shortage...we have moved from scarcity to food security." নতুন আইনের ফলে রপ্তানি বাণিজ্য থেকে আয়ের সম্ভাবনা যেমন বাড়বে, তেমনই দেশে সংরক্ষণ ও শস্যাগার নির্মাণ-শিল্পের সুযোগ ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। ফসলের অপচয় রোধ করাও সম্ভব হবে। কিন্তু বিল পেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু করে দিল মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বিরোধী দলগুলি। বিরোধিতা গণতন্ত্রের পক্ষে সুলক্ষণ। তবে এই বিরোধিতার যুক্তি ও ধরন কিন্তু আলাদা। সেখানে যারা বসে রইলেন, তাদের ক'জনকে কৃষক বলে চেনা যায়? আন্দোলনে কাদের মুখ দেখা গেছে, তাদের রণকৌশল কী, স্লোগান কী, ব্যানার পোস্টারে কী লেখা হচ্ছে—সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, ভারতবিরোধী নানান বিচ্ছিন্নতাবাদী, শক্তি অন্তরালে থেকে কিছু কৃষককে সামনে এগিয়ে দিয়েছে। এরা মোটেই সামগ্রিক কৃষকের যথার্থ প্রতিভূ নয়। যারা এতদিন বাজারে দালালি করে কৃষকের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফসলে নিজেদের পরিপুষ্টি ঘটাতো, কাটমানিতে ফুলেফেঁপে উঠতো, তাদেরই একটি সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস হচ্ছে এই আন্দোলন। তা দেশের কৃষকের নামে চালানো অন্যায়। আন্দোলনের নামে অসত্য ও অর্ধসত্য বিবৃতি দেওয়াও অপরাধ।

বিরোধীদের জবাবে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছিলেন এই বিল চাষিকে বীজ বোনার সময়েই ফসলের দামের গ্যারান্টি দেবে। বিক্রয় চুক্তি কেবলমাত্র উৎপাদনের উপর, তার সঙ্গে কৃষিজমির কোনো সম্পর্ক নেই। কৃষক চুক্তি থেকে সরে আসতে পারে, ব্যবসায়ী পারবে না। কৃষক ও তার কৃষিজমি পুরোপুরি সুরক্ষিত। তিনি বিরোধীদের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন, কোনোদিনই কি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইনের অঙ্গ ছিল? কংগ্রেস তো ৫০ বছর শাসন করেছে। তারা কেন এতদিন তা আইনের অঙ্গীভূত করল না? বিরোধীরা কৃষিবিলকে রাজনৈতিক ইস্যু করেছে, যেহেতু এই বিলের বিরুদ্ধে সমালোচনার আর কোনো জায়গা নেই। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সবসময় ভারত সরকারের একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তই ছিল এবং আগামীদিনে থাকবে। নতুন আইনে কৃষক দেশ জুড়ে যেকোনো কৃষিজ পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। এই আইন কৃষককে পণ্য বিক্রির সুযোগ বাড়াতে সহায়তা দেবে। মান্ডি বা কৃষি-বাজারে যেভাবে কৃষকেরা আর্থিকভাবে শোষিত হয়, মানসিকভাবে প্রতারিত হয়, তা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি করবে আই আইন।

আন্দোলনকারীরা নাছোড়। সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বারে বারে কথা বললেও, তারা আসলে সমাধান চাইছেন না। দেশে আন্দোলনের নামে অস্থিরতা তৈরি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রশ্ন উঠেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আন্দোলনকে হাইজ্যাক করেছে কিনা। যে দাবিমঞ্চে খালিস্তানপন্থী, মাওবাদী, শাহিনবাগ ও ভারতবিরোধী মুসলিম নেতাদের দেখা যায়, সেই আন্দোলন আসলে কী! যে আন্দোলন চলাকালীন স্লোগান ওঠে—'মোদী তেরি কবর খুদেগী, আজ নেহি তো কাল!' 'ইন্দিরাকো ঠোক দিয়া, মোদী কেয়া হ্যায়!' ,'পাকিস্তান হামারা দুশমন নেহি হ্যায়, দিল্লি হামারা দুশমন হ্যায়!', 'কৃষি বিল ইজ অ্যান্টি শিখ!' সেখানে যাবতীয় আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হয় বই কী ! কৃষিবিল নিয়ে এই কট্টর বিরোধিতা কেনই-বা কেবলমাত্র পঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মতো স্থানে জন্ম নিল। কেনই-বা অবশিষ্ট ভারতে তার প্রভাব নেই? যে অঞ্চলের মানুষ আন্দোলন করলেন, সেই রাজ্যের কৃষকের গড় পারিবারিক আয় অন্য রাজ্যগুলি থেকে অনেক বেশি।

এই আইন রূপায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সবচাইতে লাভবান হবেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গে ফসলের বৈচিত্র্য আছে, আছে জাত বৈচিত্র্যও। সারা বিশ্বের কাছেই এর চাহিদা ও আদর। ভুললে চলবে না, এখানকার মাটি সোনা, তাতে ফলন ভালো, তাই আয় বাড়বে।

(লেখক কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

বাঙ্গলার সংস্কৃতি কোথায় নেমেছে মুখ্যমন্ত্রীর শব্দ ব্যবহারে সেটি স্পষ্ট

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

২০২১-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গেই রাজ্যটিকে সমগ্র ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর আজ্ঞাবহ পারিষদেরা কোনো কসুর করছেন না। প্রত্যেকেই শুনছেন পশ্চিমবঙ্গ আলাদা। এখানকার সংস্কৃতি অতি উচ্চমানের (যার অতি বিকৃত ও উৎকট প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর বাক্যোচ্চারণের মধ্য দিয়ে নিয়ত স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ছে।)। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা রাজ্যবাসীকে প্রতিদ্বন্দ্বী দলটির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে প্রয়োজনে হিংসাত্মক করে তোলা (ইতিমধ্যেই ১৩৫ জন বিজেপি সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে। সংখ্যাটা নির্বাচন সমাগমে নতুন রেকর্ড করতে উন্মুখ)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে পশ্চিমবঙ্গ আলাদা, একে গুজরাট হতে দেওয়া যাবে না, এসব কথার কি আদৌ কোনো সারবত্তা আছে? গত জানুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা বহু নিন্দিত জিএসটি খাতে করোনা পরবর্তী সময়ে ১ লক্ষ ১৯ হাজার কোটি টাকার রেকর্ড সংগ্রহ হয়েছে। এই সংগ্রহবৃদ্ধির মানে প্রতিটি রাজ্যের মাথা পিছু প্রাপ্যেও বৃদ্ধি। রাজ্য প্রতি সেই প্রাপ্য প্রয়াত নেতা অরুণ জেটলি ৩৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি ঘটিয়ে ৪২ শতাংশে বেঁধে দিয়ে যান। এর ফলে কি পশ্চিমবঙ্গের কর আদায় বাড়েনি? তিনি জিএসটির পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়েও এর সমালোচনা করেন তিনি কখনও রাজ্যের সংস্থাগুলি যাদের জিএসটি দিতে হয় বা যারা নানা কৌশলে এই রাষ্ট্রীয় কর ফাঁকি দিয়ে পক্ষান্তরে রাজ্যের প্রাপ্যেই ঘাটতি ডেকে আনে তাদের কাছে নির্দেশ পাঠান না যে সকলে সময়ে এবং সঠিকভাবে কর জমা দাও। বিভিন্ন কর আদায়কারী সংস্থা ও কেন্দ্রীয় হিসেবে দেখা যায় একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের জিএসটি এড়িয়ে চলার ও ফন্দি ফিকির তৈরি করার প্রবণতা আছে। এখানেও কিন্তু সেই ভোট অঙ্কের হিসেব খেলা করে। এই তঞ্চকতার থেকে নজর ফিরিয়ে রাখা হয়। প্রধানত চর্মজাত দ্রব্য, পরিধেয়, জরির কাজ সমন্বিত মাঝারি মাপের শিল্পোদ্যোগগুলিতে এদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রসঙ্গত, বিগত করোনা পরবর্তী উপর্যুপরি শেষ চার মাসে প্রত্যেকটিতেই জিএসটি ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এই ক্রমাগত বর্ধিত সংগ্রহের ভাগ কি এই তথাকথিত আলাদা জাতি বা গোত্রের পশ্চিমবঙ্গ পাচ্ছে না? এই স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধির মূলে শুধু জিএসটি নয় আয়কর, কাস্টমস বিভাগের সমবেত প্রচেষ্টাতেই দেশে সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যোন্নতি হচ্ছে। উল্লেখিত সংস্থাগুলি কিন্তু সকলেই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ। আমাদের রাজ্য সরকার তাঁর নিজস্ব পরিচালনাধীন সংস্থাগুলিকে কেন মাননীয়ার বিদগ্ধ অনুপ্রেরণায় কখনও জাগরুক করে তোলেন না যাতে সমগ্র জাতির উন্নতি সাধিত হয়? এই বর্ধিত জিএসটি আদায় যা আজ অর্থনীতির মেরুদণ্ড তার লক্ষণীয় ঊর্ধ্বমুখিতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এই জানুয়ারি মাসের জিএসটি সংগ্রহে রাজ্যগুলির অংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯১০৪ কোটি টাকা। জিএসটি রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯০ লক্ষ (ডিসেম্বর ২০২০ অর্থবর্ষ অবধি)। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ফাঁকিবাজ ও কর জালিয়াতদের ওপর মজবুত আইনি খড়্গ নেমে আসার ভয় সংগ্রহ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। ২০২০-র এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্র রাজ্য জিএসটি চুক্তি অনুযায়ী ২.০৬ লক্ষ কোটি টাকা সমস্ত রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলে চলেছেন কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে লুটছে। কিছু মানুষ হয়তো তাঁর বিষাক্ত মিথ্যাভাষণগুলিই হজম করছেন। কেননা বিষয়গতভাবে এটি একটু জটিল। আগামীদিনে অন্তর্দেশীয় (বহু ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক) বিমান পরিষেবা, হোটেল বিভিন্ন সার্ভিস সেন্টার, বিনোদন ক্ষেত্রগুলি (সিনেমা, থিয়েটার পানশালা) খুলে গেলে এই আদায়ে বিপুল বৃদ্ধি ঘটে দেশকে নিশ্চিত অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার সংকেত দিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে এবারের বাজেট প্রস্তাবে ৬৭৫ কিলোমিটার কলকাতা শিলিগুড়ি বিশ্বমানের সড়ক তৈরির জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর রূপায়ণে এই বিপুল অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলে যাবে। ৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হলদিয়া বন্দরে ৪৫০০ কোটি টাকার বিশাল পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করে গেলেন। তাঁর উদ্বোধনের অর্থ ভবিষ্যতে কাজটা হওয়া। যেমন ৩৭০ ধারা বিলোপ হলো, তিন তালাক বিল পাশ হলো আর অর্থনীতি ক্ষেত্রে আইবিসি, এনসিএলটি— কত বলা যায়! এগুলি কয়েক বছর ধরে কার্যকর হয়ে গেছে। দেশ তার সুফল পাচ্ছে। কৃষি আইনের কথায় পরে আসছি।

একই সঙ্গে বহুল সম্প্রচারিত 'উর্জা গঙ্গা' প্রকল্পের অধীনে ৩৪৭ কিলোমিটার ধোবী-দুর্গাপুর প্রাকৃতিক গ্যাস পাতাল পাইপ

লাইনেরও উদ্বোধন হলো। এই যুগান্তকারী প্রকল্প সিন্ধ্রির সারকারখানা, দুর্গাপুরের ম্যাট্রিক্স সার প্রকল্প ছাড়াও শিল্প, বাণিজ্য ও অটোমোবাইল ক্ষেত্রেও নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করবে। পশ্চিমবঙ্গের বহু শহরে যেমন পুরুলিয়া, আসানসোল, দুর্গাপুরের মানুষজন বাড়িতে পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহের অভূতপূর্ব সুবিধে পাবেন। প্রকল্পগুলি হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে হওয়ার কারণে নেপাল, ভুটানের মতো কেবলমাত্র স্থলভাগের মধ্যে আবদ্ধ পড়শী দেশগুলির সঙ্গে আমদানি রপ্তানি চলার পথ সুগম করবে। এখানে কোনো ভোটের ভাবনা নেই— নিখাদ দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলার পরিকল্পনা। তাই হয়তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কুশলী মস্তিষ্কে এসব ঢোকে। কেননা পশ্চিমবঙ্গ তো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে! দুর্ভাগ্য বাঙ্গালির। ৫ লক্ষের 'আয়ুষ্মান ভারত (যেখানে বরাদ্দ ২ লক্ষ ৭৩ হাজার কোটি) ছেড়ে স্বাস্থ্যসাথী নামের এক অলীক ইন্টারনেটে সাথীর মতো প্রকল্পের পেছনে ছুটছে পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে বরাদ্দ মোট স্বাস্থ্যখাতে ১১ হাজার কোটি। শুধু তাই নয়, যে মরীচিকা ভোট মিটে গেলেই হয়তো ভ্রূণেই স্খলিত হয়ে পড়বে।

আমাদের মহাজ্ঞানী শাসকের যে কোনো সভা বা উনি সরকারি মিটিঙের প্রটোকল গ্রাহ্য না করায় যে কোনো বক্তৃতাই অবলীলায় ভোট বক্তৃতায় রূপান্তরিত হয়। যেখানে তিনি কতকগুলি বহু ব্যবহারে জীর্ণ শব্দবন্ধ প্রয়োগ করেন। কালাকানুন, দেশ বেচে দেওয়া, লুটেরা সরকার, গণতন্ত্র হত্যাকারী ইত্যাদি। একটা উদাহরণ নিন 'কয়লাখনি বেচে দিল'। অথচ গত ৪ ফেব্রুয়ারি ইস্টার্ন কোল ফিল্ড যা এ রাজ্যেই পড়ে তারা ২ হাজার ৯ শো কোটি টাকার এক ঐতিহাসিক চুক্তি করে বেলারুশের কাছ থেকে ৯৬টি ডাম্পার কিনেছে। এই চুক্তি নীতিগত ভাবে ২০২০ সালের আগস্ট মাসেই সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেয়েছিল। কেননা এই পদ্ধতি ইতিপূর্বেই দেশের কয়েকটি জায়গায় চালু আছে। কোল ইন্ডিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী এই গোটা অর্থই জোগাবে সিআইএল নিজে যাতে দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ হবে। খোলা কয়লাখনি থেকে কয়লা তোলার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আসবে। এগুলি উনি মাথায় রাখেন না। ব্যাপারটা ভোটব্যাধি আক্রান্ত মাথার পক্ষে হয়তো গোলমেলে। হলদিয়া প্রকল্প সূত্রে ভুটানের প্রসঙ্গ এসেছিল। আচ্ছা, মাত্র আড়াই বছর আগের ভুটান সীমান্তে চীনের বিপুল সৈন্য সমাবেশ কি দেশ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গবাসী ভুলে গেছে? দীর্ঘ ৭৮ দিন চীন সেনার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান বীর ভারত-সেনানী। এই বলের উৎস ছিল নির্ভীক রাষ্ট্রনেতার ভরসা। পিছু হটতে বাধ্য হয় শত্রুসেনা। চীন কি ভুটানের মতো মেদেনীপুর আয়তনের দেশ অধিকার করতে এসেছিল বলে মনে হয়? পরবর্তীকালে সমর বিশারদরা বিশ্লেষণ করে বলেছেন চীন এই নতুন ফ্রন্টে যুদ্ধ প্রস্তুতিই নিয়েছিল। মাননীয়া এবার যুদ্ধ আর পুঞ্চ, রাজৌরী সেক্টরে হতো না, হতো আমাদের শোওয়ার ঘরে। ভুটান থেকে উত্তরবঙ্গের জলগাঁও পায়ে হেঁটে ৫ মিনিট। দেশের চিরবালখিল্য বিরোধী কংগ্রেস নেতা কেন যুদ্ধ হলো না তাই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে গালমন্দ করতে বাকি রাখেননি। হলে এই আলাদা চরিত্রের পশ্চিমবঙ্গকে কি 'জয় বাংলা' বাহিনী বাঁচাতো? এগুলো ভাবা না হলেও নিদেনপক্ষে ভাবা প্রাক্টিস করা উচিত।

বাম আমলে বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে তিনি লাশ খুঁজে বেড়াতেন, এখন মোদীর ছিদ্র খোঁজেন। কৃষি বিল ৬ মাসের আগে পাশ হয়ে গেলেও এখানকার কৃষকরা কোনো প্রতিবাদ সংগঠিত করেনি। তিনি নতুন করে পঞ্জাব সীমান্তে ভুল বোঝাতে লোক পাঠাচ্ছেন। তিনি জানেন না পঞ্জাবের কংগ্রেস সরকার সম্প্রতি 'Produce marketing reforms' নামে একটি আইন পাশ করেছে। যাতে উৎপন্ন কৃষিপণ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়। যোগেন্দ্র যাদব, মৃণালিনী দেশপাণ্ডে যাদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইনে কেস হয়েছে তারা প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় আন্দোলনকারী নয় আন্দোলনজীবী। এটি তাঁদের পেশা, এতে দেশ-বিদেশ থেকে রোজগার আছে। কিন্তু কৃষককে সমৃদ্ধ করে তুলতে কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানি জরুরি। ভারতের বাসমতী চাল, লবঙ্গ, মশলা থেকে শুরু করে বহু ভোগ্যপণ্যই দেশ রপ্তানি করে। কিন্তু বিশ্বের অনেক ছোটো ছোটো দেশ যেমন গ্রিসের দই, হল্যান্ডের চিজ যদি বিশ্ব বন্দিত ব্রান্ড হতে পারে আমাদের মাখন, পনির, ঘি, কাশ্মীরি আপেল, নাগপুরের লেবু কেন হতে পারবে না? কৃষি আইন আমরা পড়িনি, সারাৎসার যা জেনেছি কৃষি ক্ষেত্রে বেসরকারি উপযুক্ত বিনিয়োগ কৃষক তথা দেশের অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। কয়েক বছর বেসরকারি মালিকদের সঙ্গে কাজ করলেই কৃষক পারস্পরিক স্বার্থের দিকটি বুঝে যাবে।

হ্যাঁ মাননীয়া, আমাদের মালদার আমের আমসত্ত্ব হয়তো রপ্তানি হয়। কিন্তু সে কতটুকু? প্রাইভেট বিনিয়োগ বড়ো পরিসরে এলে তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। উত্তর দিনাজপুরে খুব অল্প জমিতে বিখ্যাত 'তুলাইপাঞ্জি' চালের চাষ হয়। কেননা খরচ অনেক বেশি, কেনার তেমন লোক নেই আবার। আপনার 'সুফল বাঙ্গলা'র বিপনি থেকেই তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট মানের ডাল বিক্রি হয়। ভালো বেসরকারি বিনিয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গকে যথার্থ শস্য শ্যামলা করার কথা ভাববার জন্য মোদীজী তো বেসরকারি উদ্যোগের পথ প্রসারিত করে দিয়েছেন। আপনি সত্যকে মেনে নিলে রাজ্যের মঙ্গল।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক)

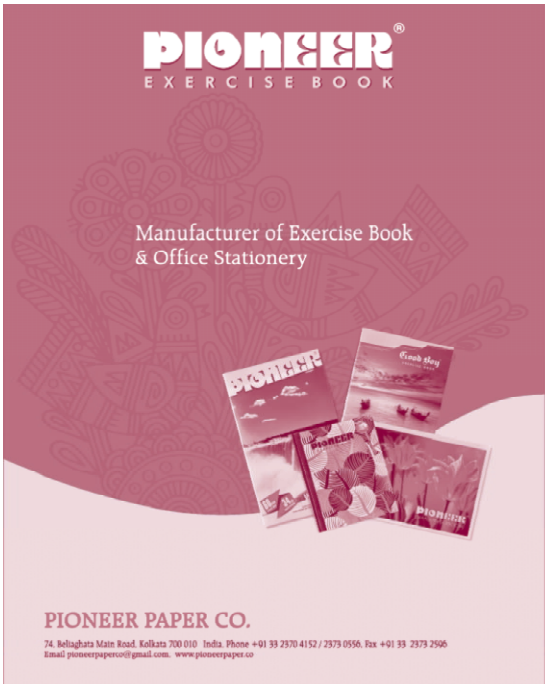

মমতা কি সিপিএমের ‘মেধাবী ছাত্রী’?

তথাগত রায়

মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী তাকেই বলে, যে মাস্টারমশাইয়ের প্রতিটি শিক্ষা অনুধাবন করে এবং অনুসরণ করতে চেষ্টা করে, সফলও হয়। সাধারণত এই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা মাস্টারমশাইয়ের সামনে বসেই পড়াশুনো শেখে। কিন্তু কখনোসখনো এমনও দেখা যায় যে মাস্টারমশাই তাকে শেখাতেই চাননি বা মাস্টারমশাই টেরও পাননি যে সে শিখছে এবং তাঁর মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী হয়ে উঠছে। মহাভারতের যুগে এমন উদাহরণ ছিল একলব্য। আজকের যুগের একলব্যের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু মমতা যদি একলব্য হন তবে তাঁর মাস্টারমশাই দ্রোণাচার্য কে? আর কেউ নয়, মমতার এক সময়কার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এখনকার পরম বন্ধু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বা সিপিএম। ব্যাপারটা এইরকম : সৃষ্টিকর্তা মমতার মাথায় মিটিং-মিছিলমার্কা রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রচুর দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতা একফোঁটাও দেননি। ওই মিটিং-মিছিলমার্কা বুদ্ধি ক্ষমতা দখল করতে, নির্বাচনে জিততে বেশ কাজে লাগে। কিন্তু তার পরে তো প্রশাসন চালাতে হবে! এই ব্যাপারে মাথা খাটিয়ে মমতা বুঝলেন, সিপিএমকে নকল করলেই তো হয়, প্রশাসন-ফশাসন আবার কী দরকার? যে মেথডে সিপিএম চৌত্রিশ বছর ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল সেই মেথডে আমিই বা পারব না কেন? যেই কথা সেই কাজ! এবার মমতা নেমে পড়লেন সিপিএমকে নকল করতে।

কিন্তু পথে কিছু বাধা ছিল। প্রথম কথা, সিপিএমের একটা মতাদর্শ ছিল—সে মতাদর্শ যতই নৃশংস ও নরঘাতক হোক না কেন। মতাদর্শ থাকলে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা সহজ হয়, শুধু ‘মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ’ বলে সেরকম উদ্বুদ্ধ করা কঠিন। দ্বিতীয়ত, সিপিএমের পার্টি সংগঠন এক কঠিন শৃঙ্খলায় মোড়া, সেখানে উচ্চতম স্তরে কোনো সিদ্ধান্ত নিম্নতম স্তরে পার্টি সংগঠনের সিঁড়ি ধরে পৌঁছে যায়। অপরপক্ষে তৃণমূলের সেরকম কোনো সংগঠন বলে পদার্থই নেই। বলা হয়ে থাকে তৃণমূলে প্রথম শ্রেণীর নেতা একজনই, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা কয়েক হাজার, আর তৃতীয় শ্রেণীর তো লেখাজোখা নেই। এরকম সংগঠন দিয়ে কী করে সিপিএমকে নকল করা যাবে?

এর সমাধানও মমতা বার করে ফেললেন। উনি সংগঠনের উপর ভরসা না করে পুলিশকেই নিজের সংগঠন বানিয়ে ফেললেন। এর জন্য পুলিশকে দলদাস বানাতে হলো বটে, কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তারা তো সিপিএমের আমলে দলদাস হয়েই ছিল, জার্সিটা পালটাতে হবে মাত্র। সিপিএমের আমলে দলদাস পুলিশের কাজ ছিল যখন হত্যাকাণ্ড বা ওইরকম কিছু ঘটছে তখন নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, এবং তার পর চরম ন্যাকা সেজে

বলা, ‘কই, আমরা তো কিছু দেখিনি’! সাঁইবাড়ি, আনন্দমার্গী, ছোট আঙারিয়া, বানতলা ইত্যাদি হত্যাকাণ্ড এই ভাবেই সংঘটিত হয়।

কিন্তু তৃণমূল আমলে চেহারাটা অন্যরকম। পুলিশ অবশ্য এখনো নিজেরা খুন করতে আরম্ভ করেনি। যেটা করছে সেটা হলো মিথ্যা কেস দেওয়া। এই লেখক নিজেই এর বলি হয়েছে ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে, হুগলি জেলার গুড়াপ থানার একটি মিথ্যা কেসে। সেখানে কিছু প্রাক্তন সিপিএম সমর্থক বিজেপিতে যোগ দিয়েছিল, তাদের হাতে পতাকা তুলে দিতে আমি গিয়েছিলাম। তারপর দুই দলের মধ্যে মারামারি হয়, তখন আমি অকুস্থল থেকে বহু দূরে। তারপর জানতে পারলাম আমার নামে খুনের চেষ্টার (ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা) কেস দেওয়া হয়েছে। একরাত্রি জেলে কাটাতে হয়েছিল। তারপর জামিন হলো বটে, কিন্তু সাক্ষ্য দিতে চার-পাঁচবার নিজের খরচে চুঁচুড়া যেতে হয়েছিল, এমনকী বেকসুর খালাস হবার পরেও মার্কিন ভিসা পেতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। তার মানে এই নয় যে তৃণমূল আমলে খুন হচ্ছিল না...বেশ ভালোমতোই হচ্ছিল। এখানে পুলিশের ভূমিকা সিপিএম আমলের সঙ্গে অবিকল এক। ২০২১ সালের নির্বাচনের আগে আনুমানিক ১৪০ জন বিজেপি কর্মীর সন্দেহজনক মৃত্যু হয়েছে। যথারীতি পুলিশ আত্মহত্যার তত্ত্ব খাড়া করে। এরকম করে একের পর এক মৃত্যু ঘটেই চলেছে।

মমতা ব্যানার্জি প্রয়োজনে নিজের দলের ছেলেদের পুলিশের গুলি খাইয়ে নাম কিনতে পারেন, রাস্তা অবরোধ করে টাটা কোম্পানিকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু নির্বাচনে জিততে গেলে ওঁকে সিপিএমের নকল করতেই হবে। উনি করেছেনও তাই এবং সেজন্যই উনি সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী।

মোটের উপর ব্যাপারটা হচ্ছে এই : মমতা ব্যানার্জি হচ্ছেন মূলত street fighter। বহু কিলোমিটার ধরে মিছিল নিয়ে হাঁটতে পারেন, বিশাল জনসভা করে প্রচুর লোক টানতে পারেন, প্রয়োজনে নিজের দলের ছেলেদের পুলিশের গুলি খাইয়ে নাম কিনতে পারেন, রাস্তা অবরোধ করে টাটা কোম্পানিকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু নির্বাচনে জিততে গেলে ওঁকে সিপিএমের নকল করতেই হবে। উনি করেছেনও তাই এবং সেজন্যই উনি সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী।

(লেখক মেঘালয়ের পূর্বতন রাজ্যপাল)

ফঃ ২

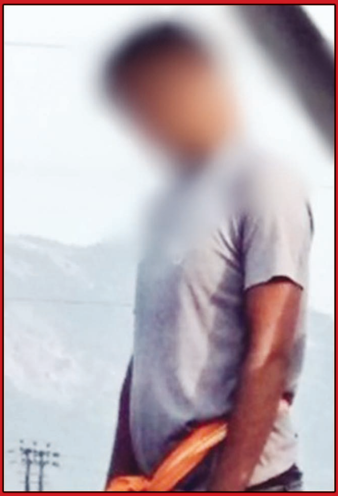

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ হোক

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের মাত্র তিনটি রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার লম্বা ইতিহাস পাওয়া যায়। এগুলি হলো কেরল, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ। এই তিনটি রাজ্যের মধ্যেই মিল একটি জায়গায়— এগুলিতে বামপন্থীরা একটি লম্বা সময় ধরে শাসন করেছিল বা এখনও শাসন করছে। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত বিহারেও রাজনৈতিক হিংসা, ভোটের সময় হানাহানি দেখা যেত— কিন্তু বর্তমানে তা ইতিহাস। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শেষ অর্ধ-শতাব্দীর বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত রয়েছে। বিগত শতকের ছয়ের দশকের শেষ ও সাতের দশকের প্রথমে অতি- বামপন্থী বা মাওবাদীদের হাতে বহু সহস্র নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়। এমনকী ১৯৭০-এর ৩০-এ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যেই জনপ্রিয়, ছাত্র-দরদি অধ্যাপক উপাচার্য গোপাল সেনকে হত্যা করে নকশাল ছাত্ররা। এই বছরেই বর্ধমানের সাঁইবাড়ির ছেলেদের হত্যা করে তাদের রক্তমাখা ভাত তাদের মা-কে খেতে বাধ্য করে কমিউনিস্টরা। ৩৪ বছরের বামপন্থী শাসনে বিরোধী দলের হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে খুন করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে মরিচঝাঁপিতে পূর্ববঙ্গ থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে আগত প্রায় ১০ হাজার বাঙ্গালি হিন্দু নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুকে হত্যা করা। এছাড়া আনন্দমার্গী, নন্দীগ্রাম, নেতাই প্রভৃতির মতো অসংখ্য গণহত্যা তো আছেই।

নির্বাচনের সময় হিংসা, বোমাবাজি, খুনোখুনি, সন্ত্রাস, মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়া এসব বামপন্থী আমল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু ২০১১-তে তথাকথিত 'পরিবর্তন'-এর পর মানুষ ভেবেছিল— এই রাজনৈতিক হিংসার ধারাবাহিকতার এবার হয়তো একটু ছেদ পড়বে। কিন্তু এই তৃণমূল সরকার যেন 'উন্নততর বামফ্রন্ট' সরকার হয়েই ফিরে এল। নির্বাচনের আগে ও সময় যে সব কাজগুলো করতে হয়তো সিপিএমের ক্যাডাররাও লজ্জা পেত— সেই কাজগুলোই অবলীলায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা করতে লাগল। ২০১৯-র ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের তিন স্তর রচনা করল তৃণমূল কংগ্রেসের 'উন্নয়ন বাহিনী'— (১) ব্লক ও মহকুমা অফিসগুলোতে লেঠেল বাহিনী দাঁড় করিয়ে রেখে বিরোধীদের নমিনেশন পেপার তুলতে বাধা দান। (২) নির্বাচনের দিন ব্যাপক ছাপ্পা। (৩) গণনার দিনও জোর করে বিরোধী এজেন্টদের ঘর থেকে বার করে দিয়ে গণনার হিসাব পরিবর্তন করে দিয়ে জোর করে জেলা পরিষদ দখল করা। আর রাজনৈতিক খুনোখুনি তো আছেই। শেষ কয়েক বছরেই রাজ্যের প্রধান বিরোধী কর্মীদের হত্যা করার একটি অভিনব কায়দাও বার করেছে বর্তমান শাসক দল। তা হলো গ্রামেগঞ্জে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা বলে চালানো। শুধু কর্মীদেরই নয়, এমনকী উত্তরবঙ্গের এক বিধায়ককেও এই একই পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছে। রাজ্যের মানুষ এই ধরনের রাজনৈতিক 'সংস্কৃতি' থেকে এবার মুক্তি চায়। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গোটা বিশ্বের কাছে সম্ভ্রমের বিষয়। অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পিছনে সবচেয়ে বেশি বলিদান যাদের— সেই বাঙ্গালিদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেই বহু বছর ধরে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত। গণতান্ত্রিক দেশের অংশ হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষ নিজের পছন্দমতো রাজনৈতিক দল করতে পারবে, পছন্দমতো রাজনৈতিক দলকে ভোট দিতে পারবে— সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনাই পশ্চিমবঙ্গে কেউ ভাবতে পারেন না। এখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সবসময়েই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এখানকার প্রশাসন ব্যবস্থার রাজনীতিকরণ। সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা ও পুলিশ এই রাজ্যে শাসক দলের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করে। ভোটে ছাপ্পা হওয়ার সময় কোনোরকম বাধা না দেওয়া, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভুলভাবে পরিচালিত করা, শাসক দলের কর্মীদের অপরাধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া, বিরোধী দলের কর্মীদের নানারকম মিথ্যা কেস দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে শাসকদলকে নানাভাবে সহায়তা করা পুলিশ-প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের এই রাজনৈতিক হিংসা, অবাধ ভোট না হওয়া এবং প্রশাসন ব্যবস্থার রাজনীতিকরণ যেন ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতিই একটি বড়সড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রবণতা অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়লে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল কোনো সরকার পশ্চিমবঙ্গে গঠিক হোক— তাই এ রাজ্যের আপামর জনসাধারণের প্রার্থনা।

(লেখক মৌলানা আজাদ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক)

স্বাস্থ্যসাথী বেসরকারি হাসপাতালের দিকে আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা

বিশ্বপ্রিয় দাস

প্রায় বছর ধরে চলা অতিমারীতে আমাদের রাজ্যের সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার নগ্ন চেহারা প্রকাশিত হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বেহাল। এখানে অতিমারীর আগে চিকিৎসকদের ধর্মঘটের কথা নাই-বা বলা গেল। হাসপাতালে দালাল রাজ, রেফার সমস্যা একটি এমন বাসা বেঁধেছে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালের শরীরে, সেটা হাসপাতালে যে সব অসহায় মানুষ চিকিৎসা করাতে আসছেন, তারাই বুঝছেন। একের পর এক সরকারি হাসপাতালে মুমূর্ষু প্রিয়জনকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে একসময়ে পথের মাঝেই চিরতরে হারাতে হচ্ছে প্রিয়জনকে। অথবা সুপারিশ বা দালাল ফিট না করলে রোগী ভর্তি হলেও সঠিক চিকিৎসার সুযোগ থাকছে না। বিনা চিকিৎসাতেই রোগী মারা যাচ্ছে। এই একাধিক খবর প্রতিদিনের খবরের কাগজের পাতায় খুঁজলেই পাওয়া যাবে। নানাভাবে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার বৃদ্ধিকে এই সরকার উৎসাহ দিয়ে চলেছে। ২০১৪-১৫-র নিরিখে যদি চিকিৎসার জন্য মানুষের মাথাপিছু খরচের হার থাকে ৫৫২ টাকা, সেটা ২০১৯-২০ তে বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৪৩ টাকা। কিন্তু সেই হারে বৃদ্ধি ঘটেনি সরকারি স্তরে চিকিৎসাখাতে ব্যয় বরাদ্দ। একটি পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যের বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাব ৭৬ শতাংশ বাড়লেও সেই হারে বাড়েনি চিকিৎসাখাতে ব্যয় বরাদ্দ। বাইরে ঝা চকচকে চেহারা দেখা দিলেও, নীল সাদা রঙের বাহার হলেও চিকিৎসা ব্যবস্থার ভঙ্গুর দশা প্রকট গ্রাম থেকে শহরে। আমাদের রাজ্যে ৭০ শতাংশ মানুষের বসবাস গ্রামে। সেখানে কম-বেশি ১২৩০০-র একটু বেশি সাবসেন্টার চিকিৎসা পরিষেবা দেয়। দেখা গেছে তার মধ্যে প্রায় ২০০০ সাবসেন্টারের নিজের বাড়ি নেই। দ্বিতীয় ভয়ংকর সমস্যা হচ্ছে চিকিৎসকের। রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বেড়েছে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে। কিন্তু সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসকের অপ্রতুলতা কেন? প্রতি ১১ হাজার মানুষ পিছু এখন আছে ১ জন চিকিৎসক, আর শয্যা আছে প্রতি ১২০০ মানুষ পিছু ১টি। ফলে সরকারি হাসপাতালে একজন চিকিৎসকের পক্ষে রোগী সামাল দেওয়া যে কত কঠিন, সেটা চিকিৎসকরা জানেন। এরপর নার্সিং স্টাফ থেকে সহায়ক কম থাকা, সঙ্গে আজকের দিনের সঙ্গে মানানসই আধুনিক চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জাম না থাকার কারণে সেই ঢাল তলোয়ার হীন নিধিরাম সর্দারের মতো অবস্থা আমাদের রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার। এখনও যে কোনো সরকারি হাসপাতালে খোঁজ নিলেই জানা যাবে, একটি অপরেশনের বেড পাবার জন্য বা সামান্য ইউ এস জি বা এরকম কোনো পরীক্ষা করাবার জন্য কত দিন অপেক্ষ করে থাকতে হয়।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার মানুষকে স্বাস্থ্যসাথী নামের একটি বিমার আওতায় এনেছে। আসলে এটি প্রকারান্তরে মানুষকে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট করাই একটা প্রচেষ্টা মাত্র। কেননা এই বিমা যারা করাচ্ছেন, সেই তিনটি বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ বেসরকারি। অর্থাৎ তাদের সরকারিভাবে ব্যবসা দেবার একটা প্রচেষ্টা নিল এই সরকার। আর সেই খাতে কত টাকা সরকারি কোষাগার থেকে চলে গেল, সেটা আর না বলাই ভালো। এক শ্রেণীর মানুষের পকেটে ঢুকল বিপুল পরিমাণ কমিশন, অন্যদিকে এই ব্যবসা করতে পারার জন্য সরকারি দলকে দিতে হয়েছে বেশ কিছু টাকা। যেটা এই নির্বাচনের আগে। ফলে তড়িঘড়ি মানুষকে এই কার্ডের প্রলোভন দেখিয়ে পরোক্ষে নির্বাচনী ভাঁড়ার ভরার কাজটাও সেরে ফেলল বর্তমান শাসক দল। এবার প্রশ্ন ওঠে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যবিমা কেন পেতে দেওয়া হলো না সাধারণ মানুষকে? সেখানে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসাক্ষেত্রে সারা ভারতে চিকিৎসা পাবার সুযোগ ছিল। আর এই স্বাস্থ্যসাথীতে রাজ্যের মধ্যে কয়েকটা হাসপাতাল ছাড়া সুযোগ নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, যতজন কার্ড হোল্ডার, তাঁদের সবাইকে চিকিৎসা দেবার মতো পরিকাঠামো আমাদের রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসাক্ষেত্রের নেই। একটু তলিয়ে দেখুন, আগেই আছে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, জননী সুরক্ষা যোজনা, সরকারি হেলথ স্কিম, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য হেলথ স্কিম, বেসরকারি বহু মেডিক্লেম কোম্পানির বিমা গ্রাহকদের চিকিৎসার সুযোগ পাবার ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে যা আছে সেগুলিকে বজায় রেখে স্বাস্থসাথীর মানুষদের সুযোগের ক্ষেত্রে কতটা দয়াবান হবে সেটা সহজেই অনুমেয়।

তৃণমূল সরকার হঠাৎ খেয়ালবশত 'দুয়ারে সরকার' নামের একটি গিমিক দিয়ে, স্বাস্থ্যসাথী বিমার আওতায় এনে, বস্তুত চিকিৎসা ক্ষেত্রে আরেকটি নৈরাজ্য তৈরি করল। কেননা মানুষ সামান্য চিকিৎসার জন্য, এই কার্ড হাতে নিয়ে আশায় বুক বেঁধে হাসপাতালে যাবেন, আর প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসবেন সরকারি পরিষেবা না পেয়ে। অবশ্য বিনা চিকিৎসা ও অবজ্ঞা নিয়ে সমাজের সহায় সম্বলহীন মানুষগুলোর জীবনের লড়াই চলতেই থাকবে। নির্বাচনের আগে তারা আশা করবেন এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন হোক।

(লেখক বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের পরিচালক)

চার দশকে ভেঙে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি

দীপ্তাস্য যশ

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর বাম সরকার সবথেকে বড়ো যে প্রকল্প গ্রহণ করেছিল তা হলো অপারেশান বর্গা বা ভূমি সংস্কার। মূল কথা ছিল, যে জমিতে খেটে কৃষক ফসল ফলাচ্ছে সেই জমির অধিকার তাকে দেওয়া। তাকে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। খুবই ভালো লক্ষ্য কোনো সন্দেহ নেই। যে কৃষক জমিতে শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় খেটে ফসল ফলায় সেই জমিতে তারও অধিকার থাকা উচিত। সেই কারণেই ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে বর্গা প্রদান করা হলো ভাগচাষি বা ছোট চাষিদের। কিন্তু সত্যিই কি তাতে তাদের আর্থিক সুরাহা কিছু হলো? এক কথায় উত্তর হলো, প্রাথমিক কিছু সুরাহা হলেও অদূর ভবিষ্যতে তারা আবারও একই আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হলেন।

ধরুন একজন চাষি একবিঘা জমিতে বর্গা পেল। এবার ধরুন তার দুটি ছেলে। দেখা গেল মূল যে বর্গাদার মৃত্যুর পরে সেই বর্গা আবার দুই ছেলের মধ্যে আধাআধি ভাগ হলো। অর্থাৎ এক একজনের ভাগে জমির পরিমাণ দাঁড়াল এক বিঘারও কম। এই অবস্থাটি খুব সহজেই বোঝা যাবে একটি সাধারণ সমীক্ষা দেখলে। পশ্চিমবঙ্গে চাষিদের গড় জমির মালিকানা ০.৭৭ হেক্টর। ৭১.২৩ লাখ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ৯৬ শতাংশই ছোট আর মাঝারি চাষি। ছোট আর মাঝারি চাষি বেশি হওয়ার দরুন কৃষিক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগও কম। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের চাষিদের গড় মাসিক আয় ৩৯৮০ টাকা। এবার বর্তমান বাজার মূল্য ধরে হিসাব করুন এই টাকায় যদি ন্যূনতম চারজনের পরিবারও ধরা হয় তাহলে সেই পরিবারের দিনাতিপাত কীভাবে হয়।

আসলে ভূমিসংস্কারকে বামেরা সামাজিক প্রকল্প বলে প্রচার করলেও তাদের মূল উদ্দেশ্যটি ছিল রাজনৈতিক। ১৯৭৭ সালে তারা যখন ক্ষমতায় আসে তখনও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি রাজনীতির বেশ ভালোই দাপট ছিল। আর এই কংগ্রেসী রাজনীতির মূল কেন্দ্রে ছিলেন গ্রামীণ সম্পন্ন চাষিরা। সেই কেন্দ্রগুলিকে ভাঙার জন্যই তৎকালীন বাম সরকার অপারেশান বর্গার আয়োজন করেছিল। কিন্তু তারপরেও ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি ভাঙা যাচ্ছিল না, কারণ প্রথম থেকেই অপারেশান বর্গায় পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি ঢুকে পড়ে। তখন বামেরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে খুনের রাজনীতির পথ নেয়। এর জলজ্যান্ত উদাহরণ বর্ধমানের সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের আয়োজন হয়েছিল যাতে গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থরা ভয় পেয়ে গ্রাম ছাড়েন এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজনীতিকে ভেঙে দিয়ে রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করা যায়।

ভূমিসংস্কারের একমাত্র লক্ষ্য ছিল গ্রামের দরিদ্র মানুষদের আরও বেশি করে দলীয় রাজনীতির উপরে নির্ভরশীল করে তুলে দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। সেই কারণেই এই সংস্কার কর্মসূচি কোনো দীর্ঘমেয়াদি ফল দেয়নি, বরং অবস্থার আরও অবনতি হয়। অথচ এই ভূমিসংস্কারকে কেন্দ্র করে যদি উন্নত কৃষিব্যবস্থা এবং তৎসংক্রান্ত বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেত তাহলে কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির চেহারা আমূল পালটে যেত। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে ভূমিহীন কৃষক জমির বর্গা পায়নি, কিন্তু সম্পন্ন স্কুল মাস্টার শুধুমাত্র পার্টির প্রতি আনুগত্যের কারণে বর্গা পেয়েছে। তবে এর থেকেও বড়ো সমস্যা হলো বেসরকারি বিনিয়োগ না হওয়া। যখন কৃষিকে ছোট জমিতে ভাঙা হলো এবং দরিদ্র কৃষক শ্রেণীকে কৃষিক্ষেত্রের মূল প্রতিনিধি নির্বাচন করতে চাওয়া হলো সেই সময়ে জানাই ছিল কৃষিতে বেসরকারি বিনিয়োগ বন্ধ হবে। সেই বিনিয়োগের অভাব মেটাতে সরকারকে

উদ্যোগ নিতে হবে।

কৃষিতে সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মোট কৃষি জমির মাত্র ৫১ শতাংশ সেচ ব্যবস্থার অন্তর্গত। শুধু এই নয় আগে পশ্চিমবঙ্গের ৮.৮৬ লাখ হেক্টর ক্যানাল ইরিগেশান অর্থাৎ খালের জলের আওতায় ছিল, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫.৬ লাখ হেক্টরে। পঞ্জাবে কোনোরকম ভূমি সংস্কার হয়নি। সেখানে মোট জমির ৯৮ শতাংশই সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এর বড়ো কারণ বেসরকারি বিনিয়োগ।

সেচের পরে আসে বণ্টন ব্যবস্থা। আগের বাম সরকার হোক বা বর্তমান তৃণমূল সরকার, দুই সরকারের সময়ে একই চিত্র। যেমন বর্তমান সরকারের সময়ে প্রতি বছরই শোনা যায় যে,যাতে শহরের বাজারে আলুর দাম বাড়তে না পারে তার জন্য অন্য রাজ্যে আলু পাঠানো নিষেধ। আবার চাষি যাতে দাম পায় তার জন্য নাকি সরকার আলু কিনবে চাষির কাছ থেকে। কিন্তু সেই ক্রয় বিক্রয় যে কোথায় হয় আর কোন চাষিরা তার সুবিধা পান তা সরকারই জানেন। সবজি চাষ করলে চাষির কিছু সুরাহা হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মূল অন্তরায় কোল্ড স্টোরেজের অপ্রতুলতা। পশ্চিমবঙ্গে কোল্ড স্টোরেজের মোট পরিমাণ ৫৯৪০৫১১ মেট্রিক টন। তার ৯০ শতাংশই বরাদ্দ আলুর জন্য। চাষি সবজি চাষ করলেও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবস্থার সুযোগ পাচ্ছে না। তাকে তাই বাধ্য হয়েই কমদামে বিক্রি করতে হচ্ছে স্থানীয় বাজারে। এবার আশা করি বুঝতে পারছেন মাসিক গড় আয় ৩৯৮০ টাকা হওয়ার কারণ।

এই পরিস্থিতিতে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার কৃষক পরিবারের সন্তানরা কৃষি ছেড়ে অন্যান্য জীবিকার দিকে ঝুঁকবে। এক্ষেত্রে দরকার ভারী শিল্পের। যাতে সেই ভারী শিল্পকে কেন্দ্র করে মাঝারি শিল্প গড়ে উঠতে পারে এবং সেই ছোট ও মাঝারি শিল্পের চাহিদায় গড়ে উঠবে কুটির শিল্প। এখানে প্রথমে বাম সরকার শুধুমাত্র নিজেদের সিন্ডিকেট রাজকে সরকারি অনুমোদন দেওয়ার জন্য ইউনিয়নের দৌরাত্ম্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। যার ফলে বন্ধ হয়েছে একের পর এক কলকারখানা। ফলে হাওড়া, হুগলীর শিল্পাঞ্চলে বাড়তে থাকল কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ধুঁকতে থাকা পরিবারের সংখ্যা। ট্রেনে বাড়ল হকার, রাস্তায় বাড়ল ছিনতাই। যে শিল্প পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করা যেত, তা না করে তাকে ঠেলে দেওয়া হলো অন্ধকারের দিকে।

রাজ্যে কর্মসংস্থানের বেহাল অবস্থার ফলে রুটিরুজির টানে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের যুবক-যুবতী। এর মধ্যে গ্রামের যুবকদের সংখ্যাই অধিক। সম্প্রতি করোনা মহামারীর ফলে ভিনরাজ্যে থাকা মানুষ কর্মহীন হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ফিরলে এখানেও কোনো রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেনি বর্তমান সরকার। শুধু গালভরা প্রতিশ্রুতিই সার।

বর্তমান সরকারের আমলে তো সিন্ডিকেট ব্যবস্থা প্রায় সরকারি ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেই, কেবলমাত্র নানা ভাতার ঘোষণা আছে এবং তাকে কেন্দ্র করে কাটমানি আছে। এমতাবস্থায় গ্রামের মানুষদের কাছে নিজেদের রোজগার বাড়াতে সবথেকে সুবিধাজনক উপায় ছিল অন্যান্য রাজ্যগুলিতে কাজের সন্ধানে যাওয়া। কথায় কথায় এই রাজ্যের রাজনীতিকরা বলেন এই রাজ্যকে নাকি গুজরাট হতে দেবেন না। খুবই ভালো কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রে আগে তো নিশ্চিত করতে হবে এই রাজ্যের মানুষকে যেন কাজের খোঁজে গুজরাটে পাড়ি দিতে না হয়। তা তো হয়নি। কলকাতা শহরে যেমন অধিকাংশ বাড়ির ছেলে-মেয়েরা অন্য রাজ্যে চাকরি করে। গ্রাম বাঙ্গলাতেও তেমনই । সুস্থ, সবল যুবকরা অধিকাংশই পাড়ি দেয় অন্য রাজ্যে। এর ফলে কৃষিতেও এখন শ্রমিকের অভাব দেখা দিচ্ছে।

অপরদিকে যখন অতিমারীর মতো পরিস্থিতি হয়, এই পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের কর্মক্ষেত্রে কাজ না থাকার দরুন ঘরে ফিরে আসেন কিন্তু সেখানেও কোনো কাজের সুযোগ তারা পান না। সবমিলিয়ে তাদের এক দিশাহারা অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর সরকার ব্যস্ত থাকে দায় ঠেলতে। আগের সরকার, বর্তমান সরকার দুই সরকারেরই মূল লক্ষ্য কিছু মানুষকে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদে অবস্থার সামাল দেওয়া। দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে কোনো আগ্রহ এযাবৎ তাদের দিক থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে ভেঙে পড়েছে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে সমাজব্যবস্থাও। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ সংস্কৃতি। ফলে বেড়ে চলেছে রাজনৈতিক হানাহানি। আগামীদিনে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে কিনা তা সময় বলবে, কিন্তু পরিবর্তন এই মুহূর্তে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(লেখক কৃষিবিদ এবং সমাজসেবী)

অপরাধপ্রবণ রাজ্য হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

হিন্দু বাঙ্গালির একমাত্র বাসভূমি এই পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার অবনতির গোড়াপত্তন স্বাধীনতালগ্নে। মূল কারণ বাঙ্গলার অসম বিভাজন ও ধ্বংসাত্মক বামপন্থা। ১৯৫৯-এ এক পয়সা ট্রামভাড়া বাড়ার জন্য লাখ টাকার ট্রাম পোড়ানোর মতো ধ্বংসাত্মক কাজ করেছিল বামেরা। ষাটের দশকে এল আরও ভয়ংকর চীনপন্থী বাম। তবে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি বদান্যতায় ধারাবাহিকভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি চলে আসছে ১৯৭৭ থেকে। ২০১১ থেকে নৈরাজ্যের চরম সীমা অতিক্রম করেছে পশ্চিমবঙ্গ।

গত জানুয়ারি মাসে সংবাদসংস্থা এএনআই রাজ্যপাল শ্রী ধনখড়কে উল্লেখ করে বলেছে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভীতিপ্রদ— 'আমাদের এখানে আলকায়দার মতো জঙ্গি গোষ্ঠী আছে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা তাদের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করলেও রাজ্যপুলিশ তা জানে না'। তীব্র ভর্ৎসনা করে তিনি বলেন, 'এটা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে ভয়ংকর'। কায়দার পাকিস্তান- পোষিত মডিউলের মুর্শিদাবাদস্থিত একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল এনআইএ। আগে কেরল থেকে ৩ জন ও এ রাজ্য থেকে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল এনআইএ। রাজ্যপাল বলেছেন যে 'এটা বোমা তৈরির আঁতুড়ঘর হয়ে গেছে। পুলিশের ডিজি দায় এড়াতে পারেন না। তাঁর উটের মতো মনোভাব খুব বিরক্তিকর'। তিনি আরও জানান যে এখানে পুলিশ কোনো অপরাধের ডায়রি নেয় না, এফআইআর হয় না। হলেও গ্রেপ্তার হয় না। তদন্ত করে না, তদন্ত যদিও বা হয় ঠিক সময়ে মামলা রুজু হয় না বা মামলার তদারকি হয় না। মামলা খারিজ হয় তথ্যপ্রমাণ না থাকায়; সেসব লোপাট করা হয়। পুলিশ থানার মধ্যে টেবিলের তলায় লুকোয়। 'শান্তিবাহিনী'র লোকেরা পুলিশের পিছনে লাথি মারে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে। পুলিশের জিপ পালিয়ে যায় জেহাদিদের ভয়ে।

নমুনা : হাওড়ার ধুলাগড়ে ২০১৬-র ১৩ ডিসেম্বর ইদ মিলাদ-উন-নবি উপলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। অন্নপূর্ণা ক্লাবের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মিছিলের থেকে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করা হয়। পরের দিন বাইরের থেকে বিশেষত মেটিয়াবুরুজ, ইকবালপুর থেকে ভোজালি, তরোয়াল, বোমা, ছোরা ইত্যাদি নিয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের পাড়ায় ব্যাপক আক্রমণ করে, প্রায় তিন চারশো হিন্দু বাড়িতে ব্যাপক বোমাবাজি, অগ্নি সংযোগ, ভাঙচুর, লুটপাট চলে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে কিন্তু পুলিশকে বারবার খবর দেওয়া সত্ত্বেও আসেনি।

২০১৬-র ৩ জানুয়ারি মালদার কালিয়াচকে প্রায় তিন লক্ষ জেহাদি জমা হয়ে কালিয়াচক থানা পোড়ায়, তিরিশ জন পুলিশ আহত হয়, তিনশো' হিন্দুর ঘরবাড়ি জ্বালায়, হামলাকারীদের দলে ছিল ড্রাগ ও আফিং চালানকারীরা। সরকারের নির্দেশে পুলিশ ও সমস্ত গণমাধ্যম নীরব থেকেছে, ডান-বাম, সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী সবাই মৃতবৎ।

২০১২ সালে ৬ জন মুসলমান ১৫ বছরের হিন্দু নাবালিকাকে ধর্ষণ করে তার দু-পা চিরে দেয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজে অকুস্থলে গিয়ে প্রতিবাদীদের মাওবাদী আখ্যা দিয়ে ধমক দেন। নিম্ন আদালত অপরাধীদের সাজা ঘোষণা করলে তারা আদালত কক্ষেই নির্যাতিতার নিকটতম আত্মীয়দের অকথ্য ভাষায় হুমকি দেয়। এখানে একতরফা— মুসলমান মারে আর হিন্দু মার খায়!

কয়লা পাচারকাণ্ডে শেষমেশ সিবিআইকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে সিএএ-র প্রতিবাদের ফল সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর থেকে প্রতিবাদকারীরা ১৯টি স্টেশন এবং ২০টা ট্রেন ভাঙচুর করেছে, আগুন দিয়েছে, ট্রেনে পাথর ছুঁড়েছে, টিকিট কাউন্টার ছিনতাই ও ট্র্যাক অবরোধ করেছে। ৬৫৫টা ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তবুও রেলওয়ে চত্বরে অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গার ঘটনার ঘটনায় মাত্র ১টা এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কলকাতায় পরপর দুদিন বিক্ষোভ সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন মোদী সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্য সরকারের বদনাম করার জন্য ট্রেন বাতিল করেছে। তিনি এই ধরনের হিংস্রতাকে 'ছোটো ঘটনা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং 'রেলওয়ের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের নয়' বলে দায় এড়িয়েছিলেন। বিক্ষোভকারীরা ৭০০টা বাস এবং টোল প্লাজা ছিনতাই করেছে তাতে

- ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ এত চেষ্টা করেও আইপিসি মামলায় অষ্টম স্থানে আছে (জাতীয় গড় ৯.৩ শতাংশ, প:ব:-৬.১ শতাংশ)।
- ডাকাতির উদ্দেশে সমবেত হওয়া—প্রথম (১৪২৪টা ঘটনা, ৪৫ শতাংশ, অপরাধের হার ১.৫, জাতীয় হার-০.৩)
- ভারতীয় দণ্ডবিধি ও রাজ্যস্তরের আইনানুসারে অপরাধ—সবচেয়ে বেশি, (হার ১০.১ শতাংশ)
- নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ—জেলাওয়ারি হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সারা ভারতে দ্বিতীয়, মুর্শিদাবাদ পঞ্চম, উত্তর ২৪ পরগনা সপ্তম, নদীয়া দশম, মোটসংখ্যায় সারা ভারতে দ্বিতীয়, অপরাধের হারেও (জনসংখ্যার অনুপাতে) দ্বিতীয়, নাবালিকা পাচারে দ্বিতীয় (১০০৩, হার ৩.৪, জাতীয় হার ০.৭)
- রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা বা তার জন্য ষড়যন্ত্র করা বা অস্ত্রসংগ্রহ করা প্রভৃতি—প্রথম (৪৫ শতাংশ)

সূত্র : এন সি আর বি

কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। গভীর রাতে রাজ্য সরকার নির্দেশ জারি করে বৈদ্যুতিন মিডিয়াকে হিংস্রতার ফুটেজ না দেখাতে বলেন।

অপরাধের তালিকা মোটামুটি এরকম : প্রাইমারি টেট, সারদা, নারদা, রোজভ্যালি, তোলাবাজি, জমি-বালি মাফিয়া-সিন্ডিকেট, দাড়িভিটের ছাত্র খুন, উড়ালপুল বিপর্যয়, চোলাই মদ, সিভিক টিচার, মাধ্যমিকের সব পত্রের প্রশ্ন ফাঁস, কোটি টাকার ছবি, হাতে ১.৫ লাখি আইফোন, হরেক উৎসব, চোরদের বাঁচাতে সিবিআই-ইডিকে আটকানো, ধরনা, ৬০,০০০ গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, শিল্প সম্মেলনের নামে জলের মতো খরচ, ইতালি -ইংল্যান্ড-ভ্রমণ, ইমাম ভাতা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি, কোটি কোটি টাকার কাটআউট, যাত্রা শিল্পীদের ১৫০০০ টাকা, শিক্ষকদের ২০০০ টাকা ভাতা, হজে মরলে ১০ লাখ, চোলাই মদে মরলে ২ লাখ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মরলে সরকারি চাকুরি, সারের দাম জানতে চাওয়ায় 'মাওবাদী' তকমা, পিএসসি-এসএসসি-তে দুর্নীতি, এসএমএস-এর মাধ্যমে ইন্টারভিউতে ডাকা।

(লেখক প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক)

এনসিআরবি-র পরিসংখ্যান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান—

জালনোট—প্রথম (৪১৫);
নারী নির্যাতন—দ্বিতীয় (৩৩২১২)।
শিশুবিরোধী অপরাধ—পঞ্চম
মানুষপাচার—প্রথম (১২৫৫)
শিশুপাচার—দ্বিতীয় (১১১৯টা)
গুরুতর আঘাত—প্রথম (১৮০৭৫-১৯.৪ শতাংশ)
৪৯৮ক ধারা—প্রথম (২০১৬৩-১৭.৮ শতাংশ)
শিশুবিবাহ—দ্বিতীয় (৪০-১৩.৭ শতাংশ)
পণের জন্য অত্যাচার—প্রথম (৩১.৭ শতাংশ)
খুনের চেষ্টা—প্রথম (১০.৭ শতাংশ, জাতীয় গড় ৩.৭ শতাংশ)
ধর্ষণের চেষ্টা—প্রথম (১৫৫১-৩৫ শতাংশ)
অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির শব উদ্ধার--চতুর্থ (৩০৮৬)
নিকট আত্মীয় দ্বারা ধর্ষণ—দ্বিতীয় (৩১৬)
হাজতে ধর্ষণ—তৃতীয়
স্বামী বা তার আত্মীয় দ্বারা অত্যাচার—প্রথম (২০,১৬০)
বিদেশ থেকে মেয়ে আনা—প্রথম (৩৩ শতাংশ)
পতিতাবৃত্তির জন্য নাবালিকা বিক্রয়—প:ব: একাই ৮২ শতাংশ।
অবৈধভাবে মানুষ পাচারনিরোধ আইনে অপরাধ—তৃতীয়
বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু—চতুর্থ
রাষ্ট্রদ্রোহিতা—দ্বিতীয়
বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আক্রমণ ঘটানোয় উৎসাহপ্রদান—তৃতীয়
বেআইনি অস্ত্রোদ্ধার—তৃতীয়
বিস্ফোরক বা বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার—ষষ্ঠ
ডিটোনেটর উদ্ধার— দ্বিতীয় (৪০১৪০)
কারখানায় তৈরি জিলেটিন— দ্বিতীয় (৪০১৪০)
দেশি ডিটোনেটর উদ্ধার— প্রথম (৪৩০৪৬, ১৯.২ শতাংশ)
দেশি বোমা উদ্ধার— প্রথম ১৩৫০৯ (৫৫ শতাংশ)
ল্যান্ডমাইন বা আইইডি উদ্ধার— চতুর্থ
গাঁজা উদ্ধার— পঞ্চম
অবৈধ মদ—তৃতীয় (২৩২৫৬৫৫ লিটার)।

চার বছর অন্তর ট্রেন্ড সমীক্ষা হয়, কিন্তু ২০১৯-এ পশ্চিমবঙ্গ রিপোর্ট জমা না দেওয়ায় ব্যুরো ২০১৮-র তথ্য দিয়ে রিপোর্ট পেশ করেছে। অপরাধের ঊর্ধ্বমুখী হওয়াই এর কারণ।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রগতির অন্তরায়

ড. শুভদীপ গাঙ্গুলী

প্রাক্ স্বাধীনতার সময়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বিচারে সর্বভারতীয় স্তরে অবিভক্ত বাঙ্গলার স্থান ছিলো সর্বোচ্চ। এমনকী স্বাধীনতার ঠিক পরেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষাহারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীয়। কিন্তু বিগত বাম শাসনের ৩৪ বছর ও বর্তমান তৃণমূল শাসনের ১০ বছরে (সর্বমোট প্রায় ৪৫ বছর) শিক্ষার মান এই রাজ্যে তলানিতে ঠেকেছে।

> **বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। ইমারত নির্মিত হয়েছে। নীল-সাদা রঙের প্রলেপও পড়েছে। কিন্তু রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটেছে কি?**

বাম শাসনের প্রারম্ভে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পঠনপাঠন তুলে দিয়ে দলদাস সৃষ্টির যে বীজ বপন করা হয়েছিল তা সমগ্র বাঙ্গালির (বিশেষত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর) মেরুদণ্ডকে স্থায়ীভাবে দুর্বল করেছে। যারা একসময়ে কবিগুরুকে বুর্জোয়া বলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, তারাই সেদিন ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথকে উদাহরণ হিসেবে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজি পঠনপাঠন তুলে দেওয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রগুলিতে বাঙ্গালি পিছিয়ে পড়ল। বিকৃত ইতিহাস ছাত্রসমাজে ছড়িয়ে দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কায়েমি স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা। এই কাজে বামপন্থীরা সফল হননি একথা বলা যায় না, কারণ বিকৃত ইতিহাস সৃষ্টিকরে স্বাধীনতা সংগ্রাম সহ সকল প্রকার রাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপে প্রকৃত ইতিহাসকে দীর্ঘদিন তাঁরা মলিন করতে সক্ষম হয়েছেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উচ্চশিক্ষায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। সরকারি কলেজগুলিতে ট্রান্সফার, নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন, নিয়োগ সব ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। শিক্ষার মানোন্নয়নে এক লজ্জাজনক অধ্যায়। মানুষ প্রভূত আশা নিয়ে ২০১১ সালে এই জগদ্দল পাথর সরিয়ে মুক্তি চেয়েছিলেন। পালাবদলের এটিই ছিল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কোনো দল অপরিকল্পিতভাবে ক্ষমতায় এলে যা ঘটে তাই ঘটল। অচিরেই মোহভঙ্গ হলো। যাও-বা স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রতিবছর কিছু নিয়োগ করতো, সেক্ষেত্রেই চলে এল স্থবিরতা। যুক্ত হল টেট কেলেঙ্কারি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক --- সর্বস্তরে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মিত গতি এবং তার সঙ্গে উপর্যুপরি বেনিয়মের লাগামহীন অভিযোগের বন্যা। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় স্তরগুলিও এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি, বিশেষত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মহাবিদ্যালয়গুলিতে সমান্তরাল নিয়োগের মাধ্যমে বিগত বামফ্রন্ট ও বর্তমান তৃণমূল সরকার যে বৈষম্য সৃষ্টি করছে তার ফল অতি মারাত্মক। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রায় কোনোক্ষেত্রেই নিয়োগ সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে শিক্ষায় কেন্দ্র-রাজ্যের যুগ্ম ক্ষমতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে উপর্যুপরি। ইমারত নির্মিত হয়েছে। নীল-সাদা রঙের প্রলেপও পড়েছে। কিন্তু মানোন্নয়ন ঘটেছে কি? উত্তর, না। কারণ অপ্রতুল শিক্ষক, পরিকাঠামোর অভাব। শিক্ষার আধুনিকীকরণে বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০তে গৃহীত প্রস্তাবনাগুলির অধিকাংশই এদের বিরোধিতার মুখে। অথচ শিক্ষাকে গুণগতভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীতকরণ ও কর্মমুখী করার ক্ষেত্রে এই শিক্ষানীতি অভূতপূর্ব। তাই আধুনিক সমাজ গঠনে, বহুমুখী শিক্ষার প্রয়োগ ঘটানোর প্রয়োজন। একথা মনে রাখতে হবে, সরকারি ক্ষেত্রে সকলের নিয়োগ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে না সাজালে বেকারত্ব সমস্যা ঘোচানো সম্ভব নয়। রাজনীতি থাকলেও কেবলমাত্র ঝান্ডাবাহক তৈরি করা শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। সুস্থ স্বাভাবিক কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আহ্বান জানাতেই হবে।

সমগ্র দেশ আজ এগিয়ে চলেছে আত্মনির্ভরতার দিকে। পশ্চিমবঙ্গকেও এগোতে হবে, যুক্ত হতে হবে আত্মনির্ভর ভারত গঠনের সংকল্পে। এক দেশে একই শিক্ষানীতি চালু করা তাই পশ্চিমবঙ্গের ভবিতব্য, যা পশ্চিমবঙ্গকে শিক্ষাক্ষেত্রের এই মাৎস্যন্যায় থেকে বার করে ফিরিয়ে দিতে পারে তার হৃতগৌরব। কেন্দ্র-রাজ্য অভিন্ন সরকার গঠনের মাধ্যমেই কেবলমাত্র তা সম্ভব। পরিবার নির্ভরতা, ব্যক্তি নির্ভরতা বর্জন করে রাজ্যবাসীকে উপহার দিতে হবে আত্মনির্ভরতা। একদেশ, মহানদেশ গঠনে এক গর্বিতরাজ্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করবে পশ্চিমবঙ্গ। ২০২১ এর নির্বাচনে প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন নাগরিককে রাজ্যের পুনর্নির্মাণের এই শপথের অংশীদার হতেই হবে।

(লেখক বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক)

শাসক পালটালেও এরাজ্যে নৃশংসতার ট্রাডিশন চলতেই থাকে

সিপিএম আমলে নন্দীগ্রামে নারকীয় গণহত্যা।

হীরক কর

মনে পড়ে এস ওয়াজেদ আলীর ওই কথাটা, 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে'। হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গে নৃশংসতা ট্রাডিশনে পরিণত হয়েছে। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সরকার থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।

১৯৭২ থেকে '৭৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সিদ্ধার্থ রায়ের বিবিধ কীর্তি ও কেলেঙ্কারির অনেক কথাই মানুষের জানা। জরুরি অবস্থার সময়ে তাঁর স্বৈরতন্ত্রী দাপট কীভাবে গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরেছিল, সে সব আজও অনেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জীবন্ত হয়ে আছে।

অগ্রজ সাংবাদিকদের কাছে শুনেছি, জরুরি অবস্থায় তাঁর দম্ভ এতটাই আকাশ ছুঁয়েছিল যে, মাঝে মাঝেই মহাকরণে তাঁর ঘরে সাংবাদিকদের ডেকে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে আঙুর-আপেলের টুকরো মুখে ফেলতে ফেলতে তিনি কথা বলতেন! অনেক সময়ে আবার রাতবিরেতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অপেক্ষা করিয়ে বলে পাঠাতেন, কোনও খবর নেই। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারির জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তখনকার রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডিকে যে চিঠি

পাঠিয়েছিলেন, তার খসড়া সিদ্ধার্থবাবুর তৈরি। শুধু তাই নয়, ইন্দিরা গান্ধীকে তিনিই নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন ওই পদক্ষেপ করার। নকশাল আন্দোলন, খুনের রাজনীতি তখন রীতিমতো ত্রাস ছড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। জনজীবন সন্ত্রস্ত। তখনই ঘটে বরাহনগর গণহত্যার মতো কলঙ্কিত ঘটনা।

সত্তরের দশকে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস সংলগ্ন কসবা-তিলজলা এলাকায় নিজেদের সমাজকল্যাণমূলক কাজের নিরিখে প্রভাব বিস্তার করেছিল আনন্দমার্গীরা। আশির দশকের শুরুতে সেই জনপ্রিয়তা ধীর গতিতে হলেও বেড়েছিল। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের ট্রাডিশনের হাত ধরে আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তৎকালীন বামপন্থী শাসকদেরও একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিরোধী কণ্ঠ যেনতেন প্রকারে রোধ করা। সেই ভাবনা থেকেই সমাজ কল্যাণে ব্রতী আনন্দমার্গীরা রোষানলে পড়ে বামেদের। আনন্দমার্গীরা 'ছেলেধরা' এমন প্রচার করে সিপিএম হত্যাকাণ্ডকে যথাযথ বলেও প্রচারের কৌশল নিয়েছিল। যে কৌশল আজও আছে।

১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল। আনন্দমার্গী ১৬ জন সন্ন্যাসী ও

ফঃ ৩

একজন সন্ন্যাসিনী কলকাতার তিলজলাতে অবস্থিত তাঁদের মুখ্য কার্যালয়ে হওয়া একটি শিক্ষা সম্মেলনে যাচ্ছিলেন। পথে তাঁদের ট্যাক্সির ভিতর থেকে টেনে বাইরে আনা হয়। একই সময় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বেদম পেটানো হয় এবং তাদের দেহগুলো একত্র করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দিনেরবেলায় প্রকাশ্য স্থানে সংঘটিত এই ঘটনা হাজার হাজার লোক প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

আশির দশক থেকে নব্বইয়ের দশক। ১৯৯০ সালের ৩০ মে গোসাবায় একটি টিকাকরণ কর্মসূচি সেরে তিন জন স্বাস্থ্য আধিকারিকের একটি দল কলকাতায় ফিরছিলেন। এই দলে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত জেলা গণমাধ্যম বিভাগের উপ-আধিকারিক অনিতা দেওয়ান, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক উমা ঘোষ এবং ইউনিসেফের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নতুন দিল্লি কার্যালয়ের প্রতিনিধি রেণু ঘোষ। সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ তারা ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের কাছে বানতলায় পৌঁছান। ৪-৫ জন যুবক স্থানীয় ক্লাবের কাছে তাদের গাড়ি থামাতে বাধ্য করে। গাড়ির চালক অবনী নাইয়া তাদের পাশ কাটিয়ে গাড়ি নিয়ে পালাতে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উলটে যায়। এই সময় আরও ১০-১২ জনের একটি দল সেখানে উপস্থিত হয়। তারা গাড়ির একজন আধিকারিককে টেনে বার করে। আগের দলটি অন্য দুই আধিকারিককে বার করে। গাড়ির চালক অবনী নাইয়া তাদের বাধা দিতে যান। কিন্তু ব্যর্থ হন। দলটি গাড়ির চালককে হত্যা করার চেষ্টা করে এবং গাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

আধিকারিকদের কাছের একটি ধানক্ষেতে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়েছিল। একজন আধিকারিক তাদের বাধা দিতে যান। ধর্ষকরা তাকে হত্যা করে। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ পুলিশ গিয়ে আধিকারিকদের নগ্ন দেহ উদ্ধার করে। তাদের ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের আপদকালীন বিভাগে ভর্তি করা হয়। প্রথম দিকে তাদের মৃত মনে করা হয়েছিল। কিন্তু দুজন বেঁচে ছিলেন। তাদের চিকিৎসা শুরু হয়। অনিতা দেওয়ানের মৃতদেহ পরীক্ষা করেছিলেন যে মহিলা ডাক্তার, তিনি ঘটনার বীভৎসতায় চিৎকার করে উঠে জ্ঞান হারান। অনিতা দেওয়ানের গুপ্তাঙ্গের ভেতরে ১ ফুট লম্বা একটি ধাতব টর্চ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। ওই দিন মধ্যরাতে গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে এই প্রতিবেদক জুনিয়র ডাক্তারের ছদ্মবেশে হাজির হয়েছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালের মেন ব্লিডিংয়ের ওই আপদকালীন ওয়ার্ডে। কিন্তু ধর্ষিতা স্বাস্থ্য আধিকারিকরা কেউই কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না।

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূর জানিয়েছিলেন, গ্রামবাসীরা আধিকারিকদের শিশুপাচারকারী মনে করে আক্রমণ করেছিল। মহাকরণের করিডোরে সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধরলে জ্যোতি বসু ঘটনার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'এরকম তো কতই হয়..'! এই ঘটনা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, 'এমন মারধরের ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।' পরবর্তীতে ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি হয়। রাজ্যে এই বীভৎস ঘটনা আলোড়ন ও তীব্র সমালোচনা সৃষ্টি করে।

কিন্তু কেন ঘটেছিল বানতলা গণধর্ষণ ও হত্যা? এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডি. বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, গ্রামীণ মানুষদের সাহায্যের জন্য পাঠানো ইউনিসেফের অর্থ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলো ব্যাপকভাবে নয়ছয় করেছিল। অনিতা দেওয়ান তা ধরে ফেলেছিলেন। প্রামাণ্য তথ্য সিজ করে গোসাবা থেকে ফেরার পথে আক্রমণ হয় তাঁর ওপর। তথ্যপ্রমাণ জ্বলে গিয়েছিল গাড়ির সঙ্গেই। আর নিজের সম্মান ও জীবন দিয়ে অনিতা দেওয়ান মূল্য চুকিয়েছিলেন শাসকদলের দুর্নীতি প্রকাশের চেষ্টা করার অপরাধের।

জ্যোতি বসুর শাসনের পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শাসনকালের দিকে তাকানো যাক। রাসায়নিক শিল্পতালুক তৈরির জন্য নন্দীগ্রামে ৩৫ হাজার একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ঘিরেই ঘটনার সূত্রপাত। নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাবের জন্য ২০০৬-এর ২৮ ডিসেম্বর জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি হয়েছিল। যা

লালগড়ে রাজনৈতিক হিংসার বলি তিন।

বাম আমলে সিপিএমের হার্মাদদের বেপরোয়া মানুষ খুন।

বাতিলের দাবিতেই আন্দোলন শুরু করেছিল ভূমি-উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত থেকে পরে রাজ্য সরকার সরে এলেও তত দিনে নন্দীগ্রামে রক্তস্নান শুরু হয়ে গিয়েছিল। ২০০৭-এর ১৪ মার্চ জমি-রক্ষা আন্দোলনকারীদের অবরোধ হটাতে গিয়ে পুলিশের গুলি চালনায় নিহত হন ১৪ জন।

তৃণমূল আমলেও সমানে চলেছে সরকারি দমন-পীড়ন

▲ নদীয়ার তেহট্টের স্কুলে সরস্বতী পুজো করতে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রীর মাথা ফাটাল রাজ্যের পুলিশ। (ফাইল চিত্র)

স্কুলে বাংলা বিষয়ক শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ▶ আন্দোলন করে দাঁড়িভিটে পুলিশের গুলিতে নিহত দুই ছাত্র তাপস বর্মন ও রাজেশ সরকার। (ফাইলচিত্র)

ওই দিনের অভিযানে পুলিশের সঙ্গেই খাকি উর্দিতে সিপিএম ক্যাডাররাও ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। পরদিনই হাইকোর্ট সিবিআইকে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল। কমিটির নেতৃত্বে ২০০৭-এর জানুয়ারি থেকে রাস্তা কেটে, অবরোধ করে, গাছের গুঁড়ি ফেলে নন্দীগ্রামকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে ১৩ মার্চ মহাকরণে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দীগ্রামে পুলিশ পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। পরের দিন সকালে ভাঙাবেড়া ও অধিকারীপাড়া দিয়ে পুলিশ নন্দীগ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে। দু'জায়গাতেই পুলিশ-গ্রামবাসী সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে ভাঙাবেড়ায় ১১ জনের মৃত্যু হয়। অধিকারীপাড়ায় মারা যান ৩ জন। পুলিশের বিরুদ্ধে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালানো এবং নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপরে অকথ্য অত্যাচারের অভিযোগ তুলে সিবিআই তদন্ত দাবি করেছিল তৎকালীন বিরোধী দল তৃণমূল।

হাইকোর্টে পেশ করা সিবিআই রিপোর্টে বলা হয়, তালপাটি খালের উপরে ভাঙাবেড়া সেতুর এক প্রান্তে পৌঁছে পুলিশ দেখে, অপর প্রান্তে অন্তত পাঁচ হাজার লোক জমা হয়েছে। জমায়েতের সামনের সারিতে মহিলা ও শিশু। পিছনে লাঠি, ভোজালি, রড হাতে পুরুষরা। ওই জনতার পিছন থেকে মাঝেমধ্যেই বোমা ও গুলি ছুটে আসছিল পুলিশের দিকে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জমায়েতকে বেআইনি বলে ঘোষণা করার পর পুলিশ ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। প্রথমে কাঁদানে গ্যাস, রবার বুলেট ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। তাতে কাজ না হওয়ায় পুলিশকে গুলি চালানোর নির্দেশ দেন ম্যাজিস্ট্রেট। প্রথমে শূন্যে ১০ রাউন্ড গুলি ছুড়লেও জনতা নড়েনি। তার পরেই জনতাকে লক্ষ্য করে ১০ রাউন্ড গুলি চালায় পুলিশ।

দশ বছর আগে সরকারের একটা সিদ্ধান্তে শান্ত সিঙ্গুর বদলে গিয়েছিল আন্দোলনের অগ্নিভূমিতে। এক দশকের লড়াইয়ের পর সেই মাটিই লিখে দিল কৃষক বিদ্রোহের অন্য আখ্যান। যাঁর নেতৃত্বে ছিলেন এক অগ্নিকন্যা। বামপন্থী সরকার বলল, কারখানা হবে। একলাখি গাড়ি কারখানা। বহু ফসলি জমিতেই হবে। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকরা জানিয়ে দিলেন, গায়ের জোরে বহু ফসলি জমি অধিগ্রহণ তাঁরা মানবেন না। শুরু হলো আন্দোলন। সিঙ্গুরের প্রতিবাদের

মন বুঝতে দেরি করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে দাঁড়ালেন অনিচ্ছুক কৃষকদের।

কৃষকরা জান কবুল করবেন, কিন্তু জমি ছাড়বেন না। ধেয়ে এল শাসকদলের লেঠেলরা। পিঠে হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া লাঠির বাড়ি। চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেওয়া কাঁদানে গ্যাস। জমি না দিতে চাওয়া মানুষগুলোকে জমিতে ফেলে বেধড়ক পেটাই। তাপসী মালিক, রাজকুমার দুলের মৃত্যু। তদানীন্তন সরকার বিষয়টিকে 'আত্মহত্যা' বলে বর্ণনা করলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই অভিযোগ করেছিলেন, টাটা-বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য 'পুলিশি অত্যাচারে' রাজকুমারের মৃত্যু হয়েছিল।

কলকাতায় ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে পুলিশের মারে প্রাণ গেল মইদুল ইসলামের।

আন্দোলনের প্রতিমূর্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মুহূর্তে শাসকের দণ্ডভার হাতে নিলেন সেই মুহূর্তে হয়ে উঠলেন স্বেচ্ছাচারী নারী। স্বৈরাচারীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি। যার প্রমাণ পাওয়া গেল পার্কস্ট্রিট কাণ্ডে। পার্ক স্ট্রিটের এক পানশালায় সুজেটের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল কাদের ও তার বন্ধুরা। ফেরার সময় বিশ্বাস করে তাদের গাড়িতে উঠেছিলেন সুজেট। অভিযোগ চলন্ত গাড়িতেই তাঁকে ধর্ষণ করে কাদের। বাকিরা মদত জোগায়। রবীন্দ্র সদনের কাছে সুজেটকে গাড়ি থেকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় তারা।

সদ্য মুখ্যমন্ত্রী পদে আসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ছিল, 'এটা সাজানো ঘটনা'। তৃণমূলের আর এক মহিলা সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার আরও এককাঠি এগিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন, 'এটা ধর্ষণের ঘটনা নয়, আসলে ওই মহিলার খদ্দেরের সঙ্গে গণ্ডগোল হয়েছিল, এটা তারই ফল'। কথা উঠেছিল কেন রাতে নাইট ক্লাবে গিয়েছিলেন ওই মহিলা? কেনই-বা অচেনা কারোর গাড়িতে লিফট নিয়েছিলেন। মহাকরণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'সব আস্তে আস্তে বেরোবে। রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে ঘটনাটি সাজানো হয়েছে।' বদলি করে দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন গোয়েন্দাপ্রধান দময়ন্তী সেনকে। তদন্ত শুরু হতে না হতেই খোদ মুখ্যমন্ত্রীর এই 'বার্তা' শোনার পরেও কি শুধু পুলিশের হৃদয়হীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়? অভিযোগ, এফআইআর করতে যাওয়ার সময় পুলিশ শুধু সুজেটের সঙ্গে দুর্ব্যবহারই করেনি, তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর ব্যাপারেও যথেষ্ট গড়িমসি করেছিল। কাদের আর আলির গ্রেফতারির খবর অবশ্য জেনে যেতে পারলেন না সুজেট। ২০১৫ মার্চে মেনিঙ্গো এনকেফ্যালাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। তবে, জেনে যান তাঁর মতোই উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের কামদুনি গ্রামের যৌন লালসায় অত্যাচারিত যুবতীর ঘটনা। ২০১৩ সালের ৭ জুন, কলেজ থেকে ফিরে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল ছাত্রীটি। সেদিন হাল্কা বৃষ্টি পড়ছিল। তাই ভাইয়ের আসতে দেরি হচ্ছিল। দেরি দেখে গ্রামের উদ্দেশে একাই হাঁটা দেয়। দিনের আলো তখনো উজ্জ্বল। ফেরার পথে ৯ জন মদ্যপ ওই ছাত্রীকে অপহরণ করে একটি নির্জন জায়গায় পাঁচিল ঘেরা অংশে নিয়ে যায়। সেখানে ওই ছাত্রীকে গণধর্ষণ করার পর নৃসংশভাবে খুন করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ ৮ জুন ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারের পর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা দোষীদের শাস্তি চেয়ে আন্দোলনে পথে নামে।

গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মধ্যে পড়েন রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম। প্রতিবাদের ভাষা বারাসত থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে কলকাতাতেও। বিভিন্ন সমাজকর্মী, মহিলা সংগঠন আন্দোলনে পা মেলায়। ওই বছর ১৭ জুন কামদুনি ধর্ষিতার গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামবাসীদের একাংশের ক্ষোভের মুখে পড়েন মুখ্যমন্ত্রীও। প্রতিবাদী টুম্পা কয়ালকে মাওবাদী তকমা দেন মুখ্যমন্ত্রী। একসময় কামদুনির প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে সরে আসে মৃতার পরিবার। তবুও আন্দোলন চালিয়ে যায় কামদুনি প্রতিবাদ মঞ্চ। অন্য এক ঘটনায় ২১ বছরের এক কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়। এই ঘটনার অভিযোগ ছিল ৯ জনের বিরুদ্ধে। হেফাজতে থাকাকালীনই এদের মধ্যে এক অভিযুক্তের মৃত্যু হয়। বাকি ৮ জনের ক্ষেত্রে রায়দান করে আদালত। ৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করলেও ২ জনকে তথ্য প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস করা হয়।

৯ জানুয়ারি ২০২০। দক্ষিণ দিনাজপুরে এক কিশোরীকে গণধর্ষণের পর পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত সাফানগরের বেলঘর এলাকায়। একটি কালভার্টের নীচ থেকে উদ্ধার হয় অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দগ্ধ মৃতদেহ। হাত-পায়ে ছিল খুবলানো দাগ। প্রমাণ লোপাটের জন্য ধর্ষণের পর তাঁকে পুড়িয়ে খুন করা হয় বলে অনুমান পুলিশের। এরপর যথারীতি তদন্তও হয়। এই ঘটনায় তিনজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধর্ষিতার মৃতদেহ সনাক্তের পর তাঁর নাম-পরিচয় জানা যায়।

এবার ২০২০ সালের ১৫ মার্চ লকডাউনের মধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে, পুলিশের লাঠির আঘাতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগ উঠে। হাওড়ার সাঁকরাইলের বানিপুর এলাকায়। মৃতের স্ত্রী অভিযোগ করেন তাঁর স্বামী সন্তানের জন্যে দুধ কিনতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় রাস্তা ফাঁকা করতে লাঠি চালায় পুলিশ। লাঠির আঘাতে লুটিয়ে পড়েন তার স্বামী ৩২ বছরর যুবক। নাম লাল। আহত যুবককে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘাষণা করা হয়। যদিও পুলিশ দায় অস্বীকার করে। হাওড়া সিটি পুলিশ ওই যুবক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় বলে দায় সেরেছিল।

চিত্রগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠলে স্পষ্ট হয়ে যায় রং বদলালেও শাসক শাসকই থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সরকার আসে, চলেও যায়। সরকার পরম্পরায় এ রাজ্যে নৃশংসতা, নির্মমতার ট্রাডিশন চলতেই থাকে। এই কথাই তো বলেছিলেন এস ওয়াজেদ আলী!

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

আল-কায়দাও পৌঁছে গেল

মুখ্যমন্ত্রী এবার মুখোশটা খুলুন

নিবারণ রায়

অনেক দিন আগে থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগের প্রমাণও মিলছিল বারে বারেই। কোথাও কোনো সন্দেহ আর ছিল না। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ল কলকাতা শহরের নাকের ডগায় মুর্শিদাবাদে খোদ আলকায়দা জঙ্গি গোষ্ঠী বাসা বেঁধেছে। অর্থাৎ রাজ্যের এবং রাষ্ট্রেরও শিয়রে শমন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে খোদ ওসামা বিন লাদেনের জঙ্গিবাহিনী যারা মার্কিন সাম্রাজ্যের গর্ব টুইন টাওয়ারকে ধ্বংস করে দিয়েছিল একটা গোটা বিমানকেই বিস্ফোরকের মতো ব্যবহার করে।

অনেক পরে হলেও ওসামাকে নিকেশ করেছে মার্কিন সরকার একেবারে পাকিস্তানে তাঁর গোপন আশ্রয়ে ঢুকে রাতের অন্ধকারে। তারপর দেহটা ভাসিয়ে দিয়েছে সাগরে শেকল বাঁধা অবস্থায়। কিন্তু আল কায়দা শেষ হয়ে যায়নি। বাপের উত্তরাধিকার বহন করছে তারই সন্তান। আর তারই ভাবশিষ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে জঙ্গিবাহিনীর নিখাদ স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে এ রাজ্যেরই আবু সুফিয়ান, মাইনুল মণ্ডল, লিয়ন আহমেদ, আল মাসুন কামাল, আতিউর রহমান, নাজমুল সাকিব, মোশারফ হোসেন, ইয়াকুব বিশ্বাস, মুর্শিদ হাসান।

না, এদের জঙ্গি বলে কেউ চেনে না। পুলিশও না। কারণ পেশায় এরা কেউ দর্জি, কেউ রাঁধুনি, কেউ ড্রাইভার, কেউ পরোটার দোকানের কর্মী, কেউ পোশাক বিক্রি করে, কেউ পরিযায়ী শ্রমিক, কেউ-বা ছাত্র। অপরাধমূলক কাজকর্মের ব্যাপারে এদের কারোরই কোনো পূর্বপরিচিতি নেই। এমনকী ডোমকলের লিয়ন আহমেদও যে পেশায় কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ।

রাজ্যের নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, মুর্শিদাবাদেরই খাগড়াগড়ের সেই বোমা তৈরির গোপন আস্তানায় বিস্ফোরণ এবং একাধিক মৃত্যুর ঘটনা। সেটা ছিল প্রদীপের সলতে। এবারকার আবিষ্কার একেবারে পরমাণু বিস্ফোরণের মতোই মারাত্মক। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)-র একগুচ্ছ বাঘা বাঘা তদন্তকারী গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও কেরলের এর্নাকুলামে আলকায়দা জঙ্গিবাহিনীর হদিশ পায়। কেরলেও অপারেট করছিল যারা তারাও পশ্চিমবঙ্গেরই বাসিন্দা। এদের দায়িত্ব ছিল কেরলে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করা।

www.edengroup.in
EDEN
HURRY!!
Limited Period Offer
Meghbalika
Only 1% GST
7.9 LACS
Onwards
1 RK
1/2 BHK
Between Rajpur & Baruipur, Khasmullick
Adda Zone
Swimming Pool
Landscape Garden
HIRA/P/SOU/2018/000209
https://hira.wb.gov.in/
AC Banquet Hall | AC Gymnasium | Outdoor Kid's Play Area
Toddlers Play Area | Guest Room | Senior Citizen Zone | Rock Climbing | Home Theater
Card Room | Art Walk with Bengal Art & Sculpture
98306 26262

এই গোষ্ঠীটি তৈরি হচ্ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণ হানা। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল রাজধানী দিল্লি ও কাশ্মীর । গত ১৯ সেপ্টেম্বরের ভোরে এনআইএ-র এই অভিযানে ধরা পড়ে বোমা তৈরি এবং মজুত করার জন্য মাটির তলায় গোপন কুঠুরি। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণে ডিজিটাল ডিভাইস, তথ্য, জিহাদি পত্রিকা, ধারালো অস্ত্র, দেশি বন্দুক, স্থানীয়ভাবে তৈরি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং বিস্ফোরক বানানোর গাইডলাইন-সহ একাধিক বইপত্র।

দেখিয়ে ওইসব যুবকদের ফাঁদে ফেলে। খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে, এদের অনেকেই বেশ বড়োমাপের ঘরবাড়ি বানিয়েছে। যে পরিমাণ অর্থ তারা খরচ করেছে, তা তাদের আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। এ থেকেই পরিষ্কার, রাজ্যের মুসলমানদের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়েই আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী আলকায়দা পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারছে।

পশ্চিমবঙ্গকেই বেছে নিচ্ছে জঙ্গিরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে, সেই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। শুধু প্রশ্নই নয়, বিতর্কও শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস দলের ৪৪ শতাংশ ভোটের প্রায় ১৪ শতাংশ জুড়েই রয়েছে মুসলমান ভোট। কারণ মুসলমান তোষণের এমন নির্লজ্জ নজির ভারতবর্ষের আর কোনোদিন কোনো সরকার সৃষ্টি করেনি। বামফ্রন্ট সরকার যেমন ৩৪ বছরের প্রশাসনে মুসলমানদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কোনো বাস্তববাদী প্রকল্প হাতে নেয়নি, তৃণমূল সরকারও গত ১০ বছরে হেঁটেছে সেই একই পথে। এরাজ্যের মুসলমান সমাজের বৃহদংশ এখনও শিক্ষার আলো দেখেনি। এরাজ্যের মুসলমান সমাজের বৃহদংশ সরকারি চাকরির সুযোগ পায়নি। এরাজ্যের বৃহদংশ মুসলমান এখনও

কেন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অপরাধীদের এত আধিপত্য? কেন এ রাজ্য আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের করিডোর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে? কেন এই বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে জিহাদি সন্ত্রাসের দিকে? এবার জবাব চাইতে হবে— পশ্চিমবঙ্গ জিহাদি সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে কাদের স্বার্থে? কার স্বার্থে?

ধৃতরা সকলেই অল্পবয়সী। তবে আলকায়দার ইন্ডিয়ান মডিউলের নেতা আবু সুফিয়ান মধ্যবয়স্ক। দর্জির পেশাটা ছিল তার মুখোশ। তার বাড়িতেই মিলেছে মাটির নীচে গোপন কুঠুরি। এনআইএ-র কাছে খবর রয়েছে, ইতিমধ্যে তিন যুবক পাকিস্তানে জঙ্গি শিবিরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এরা সকলেই সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গেরই বাসিন্দা। ইতিমধ্যে এই সুফিয়ানের নেতৃত্বেই আলকায়দা ডানা ছড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা ও বীরভূমে এবং এদের সমস্ত কার্যকলাপই সীমাবদ্ধ শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়ের মধ্যে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, সাধারণভাবে ধৃতরা সকলেই গরিব পরিবারের সন্তান। মধ্যপ্রাচ্যের আলকায়দা গোষ্ঠী পাকিস্তানের সাহায্য নিয়ে (সম্ভবত বাংলাদেশেরও) প্রচুর টাকা পয়সা লোভ নানা মঞ্চে। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একটা বিবৃতিতে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ বারুদের স্তূপের ওপর বসে রয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি মাদ্রাসা এক একটি সংখ্যালঘু সন্ত্রাসী তৈরির কারখানা। রাজনীতির স্বার্থে সেদিনও বামফ্রন্ট মুখ্যমন্ত্রী চরম সত্য স্বীকার করলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। গত ১০ বছরে সেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বেড়েছে কয়েকশো গুণ। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলি এখন প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ঘরে ঘরে তৈরি হয়েছে মুসলমান জেহাদি। পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। রাজ্য সরকার সব বুঝেও মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে। কারণ জিহাদিদের গায়ে হাত দেওয়া মানেই ভোটবাক্সে তার প্রভাব পড়া।

নির্বাচনী অঙ্ক প্রমাণ করেছে বারে বারে, পুষ্টির অভাবে রোগগ্রস্ত। অথচ জন্মসংখ্যার নিরিখে এদের গতিপথ অবাধ ও অবারিত। ফলত, রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়লেও. এই সম্প্রদায়ের মানুষ কখনও প্রগতির স্বাদ পায়নি। কোনো সামাজিক সংস্কৃতি এদের মনুষ্যত্বকে উন্নত করতে পারেনি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির অভাব এদের জড়বাদী করে তুলেছে। একদিকে সুচিন্তার মননের অভাব, অন্যদিকে দুঃসহ দারিদ্র এরাজ্যের মুসলমান সমাজকে টেনে নিয়ে গেছে জেহাদের পথে।

না, জেহাদ ওই সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য নয়। হিন্দু বিরোধী সন্ত্রাস গড়ে তোলবার জন্য। দারিদ্র ও শিক্ষার অভাব এদের মস্তিষ্ককে চালিত করেছে দেশি বিদেশি মৌলবাদী চিন্তার দাসত্বের পথে। ফলে মুসলমান সমাজের সুবিধাবাদী অংশ এদের ব্যবহার করেছে অর্থের বিনিময়ে। দুবেলা

দুমুঠো পেট ভরা খাবারের সঙ্গতির বিনিময়ে। এদের শেখানো হয়েছে, জেহাদই বাঁচার একমাত্র পথ, মলজিদ হলো তাদের দুর্গ আর মাদ্রাসা হলো তাদের জ্ঞানপীঠ।

অতএব যা হবার তাই হয়েছে। বছরের পর বছর ভোটবাক্স অটুট রাখতে এরাজ্যের কংগ্রেস, সিপিআইএম-সহ প্রায় সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং আরও বেশি মাত্রায় তৃণমুল কংগ্রেস মুসলমান তোষণের তাস খেলছে। এখনও খেলছে। কখনও পরিণতির কথা ভাবেনি। ভাবেনি, এমন কোনোদিন হতে পারে যেদিন গোটা রাজ্যটাই উড়ে যাবে ভয়াবহ বিস্ফোরণে। পশ্চিমবঙ্গের আকাশ ঢাকবে কালো ধোঁয়ায়। রাজ্যের বাতাস ভরে যাবে বারুদের কটুগন্ধে। সেদিন কিন্তু কোনো ভোটবাক্সই বাঁচাতে পারবে না।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ভাববার মতো বিষয় উত্থাপন করেছে। তাঁরা বলেছেন, আলকায়দা গোষ্ঠীর পশ্চিমবঙ্গ মডিউলের সদস্যরা বৃহত্তর আদর্শ হিসেবে ওসামা বিন লাদেনের ঘোষিত দুনিয়াব্যাপী জিহাদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিতে অবশ্যই প্রলুব্ধ হয়েছে। ম্যাক্রো লেভেলের এই ভাবনাচিন্তার মূল কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ। কারণ, মুর্শিদাবাদ প্রধানত মুসলমান প্রধান জেলা এবং মুসলমান ঘরানার উত্তরাধিকার। একসময়ে মুর্শিদাবাদ ছিল বাঙ্গলার রাজধানী। নবাব আলিবর্দি খাঁ ও নবাব সিরাজদৌল্লার আমলের মুসলমান আধিপত্যের ইতিহাস এখনও এরাজ্যের মানুষকে আবেগে ভাসায়। বাসনা জাগায় নবাবি আমলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেতে। এখানে বহু পরিবার আছে যাঁরা হয়তো রিকশা বা টাঙ্গা চালিয়ে দিন গুজরান করেন কিন্তু নিজেদের সিরাজদৌল্লার বংশধর বলতে লজ্জা পান না। বরং গৌরব বোধ করেন। এও একধরনের আবেগ মথিত ভাবনা। এদের বিভিন্ন দেশি বিদেশি সংখ্যালঘু জঙ্গিমহল থেকে বোঝানো হয়েছে— এই দারিদ্র, এই উপেক্ষা তাদের প্রাপ্য নয়। নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে হলে বিশ্বব্যাপী মুসলমান জনসংখ্যার আধিক্য বাড়াতে হবে। জনশক্তি দিয়ে এলাকার জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে হবে। গোটা বিশ্ব হবে মুসলমানদের। সেদিনই ফিরে আসবে শারিয়া আইন। সেদিনই তাঁরা ফিরে পাবেন প্রকৃত সুখ। এমন সুড়সুড়িও দেওয়া হচ্ছে যে একদিন দুই বাঙ্গলা এক হয়ে যাবে এবং সেদিন বৃহত্তর বাংলাদেশ মুসলমান দেশ হিসেবেই গণ্য হবে। অতএব লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে।

এই পশ্চিমবঙ্গের মসজিদে মসজিদে ইমাম ও মৌলবাদী মুসলমান নেতৃত্ব সেই পক্ষেই প্রচার চালাচ্ছে। তারা সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছেন ব্যাপক হারে। শিক্ষা ও চেতনার অভাবে জড়মস্তিস্ক মুসলমান নবযুবকরা সেই প্রচারকে লালন করছেন। বিতরণ করছেন। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে ছড়িয়ে যাচ্ছে হিন্দু-বিদ্বেষ। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের হাতে হাতবদল হচ্ছে ধ্বংসের মানসিকতা, বিস্ফোরণ সাম্প্রদায়িকতা।

অতি সম্প্রতি ধরা পড়া আলকায়দাভুক্ত জঙ্গিদের কাছ থেকে এনআইএ উদ্ধার করেছে স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অব ইন্ডিয়া (এসআইও)-র বেশ কিছু প্রচারপত্র। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, মূলত ছাত্রদের মধ্যে বিষ ছড়ানোর জন্যই এইসব প্রচারপত্র বিলি চলছে গোপনে। এর আগে মুর্শিদাবাদেরই ধুলিয়ানে এরকম লিফলেট পাওয়া গিয়েছিল। বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের মূলেও ছিল এই এসআইও। গোয়েন্দারা বলছেন, ধুলিয়ানে নাকি সম্প্রতি বেশ কিছু তালিকা ফতেয়া জারি করা হয়েছে যার শিকার হচ্ছেন গরিব মুসলমান পরিবাররা, বিশেষ করে মেয়েরা। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা।

অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার যে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনী যখন এত গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করছে এবং দিল্লি থেকে উড়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের ঘাঁটিগুলিকে দখলে নিচ্ছে, তখন রাজ্যের গোয়েন্দাদপ্তর বা পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে আছে। মুখ্যমন্ত্রী গর্জন করছেন, কেন রাজ্যের পুলিশকে না জানিয়ে এইরকম অপারেশন করা হচ্ছে?

উপায় কী? রাজ্য সরকার যদি তার দায়িত্ব পালন না করে তাহলে কেন্দ্রকে সে দায়িত্ব নিতে হবে। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে, দেশের নাগরিক নিরাপত্তার কথা না ভেবে শুধুমাত্র ভোটের কথা ভেবে যদি কোনো রাজ্য সরকার চোখবুজে বসে থাকে, তাহলে কি কেন্দ্রও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে?

না, থাকবে না। এই সব ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, রাজ্য সরকার ঠিক কী চাইছে? কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার? কেন রাজ্য এবং রাজ্যবাসীকে নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী? রাজ্যের গত ১০ বছরের সমস্ত অপরাধজনিত ঘটনার হিসাব মেলালে দেখা যাবে ৯০ শতাংশ অপরাধের পিছনেই রয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। ধর্ষণ, খুন, অপহরণ, নারীপাচার, নাবালিকার শ্লীলতাহানি, জোর করে একাধিক বিবাহ করা, জোর করে হিন্দু নারীকে ধর্মান্তরিত করা, ডাকাতি, রাহাজানি, প্রতারণা— সব কিছুই পিছনের মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের হাতের ছোঁয়া। এদের কতজন শাস্তি পায়, আর কতজন পায় না, সে হিসাব মেলানো দুষ্কর। কিন্তু প্রশ্ন হলো— বাড়াবাড়িরও তো একটা সীমা আছে? সরকারের চোখ বুজে আয়েস করে বসে পান চিবোনরও একটা সীমা আছে? ভাই-ভাইপোদের পাইয়ে দেবার রাজনীতিটাও তো কোথাও একটা থামবে? হিন্দু জনগণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উতপ্ত করে তোলার চক্রান্ত তো আর চলতে দেওয়া যাবে না। মুর্শিদাবাদের ঘটনা মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে।

এবার রাজ্য সরকারকে জবাব দিতে হবে— কেন এরাজ্যে মুসলমান অপরাধীদের এত আধিপত্য? কেন এ রাজ্য আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের করিডোর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে? কেন এই বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে জিহাদি সন্ত্রাসের দিকে? প্রশ্ন করার দিন এসে গেছে। আর দেরি নয়। এবার জবাব চাইতে হবে— পশ্চিমবঙ্গ জিহাদি সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে কাদের স্বার্থে? কার স্বার্থে?

মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিন। মুখোশটাকে খুলে পাশে রাখুন। অন্ধকারকে তাড়ান। আলো ফেরান। তাতে সবার মঙ্গল। আপনারও, আপামর রাজ্যবাসীরও। ❑

কৃষিবিল, কৃষক আন্দোলন
বাস্তবতা বনাম ষড়যন্ত্র

কল্যাণ গৌতম

সম্প্রতি কৃষি বিষয়ক তিনটি বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় পেশ ও উত্তীর্ণ হয়ে, মহামহিম রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে আইনরূপে বলবৎ হয়েছে। ১. কৃষি পণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য (উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতি) আইন, ২. কৃষক (ক্ষমতায়ন ও রক্ষা) মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি পরিষেবা আইন এবং ৩. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইন।

কৃষিপণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য আইনের ফলে এমন একটি ইকোসিস্টেম বা তন্ত্র রচনার বন্দোবস্ত হচ্ছে যেখানে কৃষক ও ব্যবসায়ী কৃষিপণ্যের ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত স্বাধীনতা ভোগ করবে। মাণ্ডিতে ফসল বিক্রি করতে গিয়ে যদি কৃষক মনে করেন তিনি প্রতারিত হচ্ছেন, যথাযথ দাম পাচ্ছেন না, তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা তার জন্য খুলে থাকছে। প্রতিযোগিতার এক নতুন ও অন্যতর মার্কেটিং চ্যানেল তৈরি হচ্ছে। দক্ষ, স্বচ্ছ, বাঁধাহীন হচ্ছে এই প্রণালী। কৃষিপণ্যে অন্তর্রাজ্য ও আন্তর্রাজ্যের বাণিজ্য সম্ভব হবে। দৃশ্যমান বাজারের বাইরেও বাজার-সদৃশ্যস্থল রচনা হবে। সম্ভব হবে বৈদ্যুতিন বাণিজ্য। আইনের মূল লক্ষ্যটি হলো, সারা দেশের জন্য সুসংহত ও অভিন্ন একটি বাজার গড়ে তোলা— 'এক দেশ এক হাট'। কেন্দ্র সরকার চাইছেন না কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কাটমানি-খোর মধ্যস্বত্বভোগী এঁটুলি পোকার মতো লাভের গুড় খেয়ে যাক। নতুন আইনে কৃষক ফসল থেকে বেশি দাম পাবেন, লাভবান হবেন। তেমনই সাধারণ মানুষ কমদামে ফসল কিনতে পেরে লাভবান হবেন। অর্থাৎ এটি যেমন কৃষক-বান্ধব আইন, তেমনই সাধারণ মানুষের উপযোগী আইন। তবে দালালদের সন্তুষ্টির আইন এটি নয়। কৃষিতে লাভ হয় না বলে যে কৃষক চাষ ছেড়ে দিচ্ছেন, তার বিপ্রতীপে এই আইন কৃষককে জমি-জিরেতের অভিমুখী করে তুলবে। মাণ্ডিতে বিক্রি করার জন্য যে শুল্ক লাগতো, এখন থেকে তা আর লাগবে না। কেউ যদি মনে করেন, তিনি লেভি দিয়ে মাণ্ডিতেই ফসল বিক্রি করবেন, তার সুযোগ বঞ্চিত হচ্ছে না। অর্থাৎ যারা বলছেন, মাণ্ডি উঠে যাচ্ছে, তা কিন্তু নয়।

প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির মতো ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্প থেকে কেন এ রাজ্যের চাষিরা বঞ্চিত হচ্ছেন? সারা দেশের কৃষক যেখানে বারো হাজার টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে গেছেন, এ রাজ্যের চাষিরা তা আজও পেলেন না। কেন্দ্র সরকার চায় চাষির অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে। ব্যাঙ্কে টাকা সরাসরি গেলে কাটমানির সুযোগ মিলবে না, তাই কি রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে শামিল হয়নি— অভিযোগ কিন্তু উঠছে।

দ্বিতীয়ত, কৃষি সুরক্ষা আইন হলো চাষের চুক্তি সংক্রান্ত একটি জাতীয় ফ্রেমওয়ার্ক। কৃষককে ক্ষমতাশালী করাই তার লক্ষ্য। কৃষি এক শিল্পের পর্যায়ে যাচ্ছে, একটি ভৌমশিল্প যেন! এখন থেকে ব্যবসায় জড়িত হবেন কৃষক। জড়িত হবেন ব্যবসায়ী ফার্মের সঙ্গে, প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির সঙ্গে, পাইকারি বিক্রেতার সঙ্গে, কিংবা খুচরো ব্যবসায়ীর

ফঃ ৪

সঙ্গে। চুক্তির ব্যাপারটা আসছে ফসল পাকার পর, কেবলমাত্র উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য। এটি আদৌ জমির বন্ধক সংক্রান্ত কোনো চুক্তি নয়। কখনই জমি হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা নেই আইনের ভাষায়। একেবারে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন একটি পদ্ধতির কথা আছে। কৃষকের লাভজনক দাম পাবার কথা আছে। চাষের শুরুতেই কৃষক লাভের ব্যাপারে স্থিরচিত্ত হতে পারবেন এই আইনে।

তৃতীয়ত, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইনে বলা হয়েছে যে কেন্দ্র সরকার কেবলমাত্র যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সহসা ও মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতি তৈরি হলে তবেই খাদ্যশস্য, ডালশস্য, আলু, তৈলবীজ ও পেঁয়াজের মতো কৃষিপণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করবে। পচনশীল ও অপচনশীল কৃষি-উদ্যান ফসলের দাম কত শতাংশ বৃদ্ধি পেলে সরকার মজুতদারি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কীভাবে তা করবে, তা সুস্পষ্ট বলা আছে এই আইনে। কোনোভাবেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বেলাগাম আইন এটি নয়। সিমেন্ট, ইস্পাতও পূর্বে অত্যাবশ্যকীয় আইনের আওতার বাইরে চলে গেছে, তাতে মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে কিন্তু ইস্পাত ও সিমেন্ট যায়নি। ১৯৫৫ সালে যখন এই আইন লাগু হয় তখন আজকের মতো কৃষি উন্নয়নের পরিস্থিতি ছিল না। আজ দেশে কৃষি উৎপাদন ও তার হার অনেক বেড়েছে। দেশ আজ কৃষিতে সাবলম্বী। তাই ৬৫ বছর আগেকার কৃষি-নীতি আজকের নীতি হতে পারে না। নতুন আইনের ফলে রপ্তানি বাণিজ্য থেকে আয়ের সম্ভাবনা যেমন বাড়বে, তেমনই দেশে সংরক্ষণ ও শস্যাগার নির্মাণ শিল্পের সুযোগ বাড়বে। ফসলের অপচয় রোধ করাও সম্ভব হবে। কিন্তু বিল পেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু করে দিল মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বিরোধী দলগুলি। বিরোধিতা গণতন্ত্রের পক্ষে সুলক্ষণ। তবে এই বিরোধিতার যুক্তি ও ধরণ কিন্তু আলাদা। আন্দোলনে কাদের মুখ দেখা যাচ্ছে, তাদের রণকৌশল কী, স্লোগান কী, ব্যানার-পোস্টারে কী লেখা যাচ্ছে— সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, ভারত-বিরোধী নানান বিচ্ছিন্নতাবাদী, শক্তি অন্তরালে থেকে কিছু কৃষককে সামনে এগিয়ে দিয়েছে। এরা মোটেই সামগ্রিক কৃষকের যথার্থ প্রতিভূ নয়। যারা এতদিন বাজার-দালালি করে কৃষকের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফসলে নিজেদের পরিপুষ্টি ঘটাতো, কাটমানিতে ফুলেফেঁপে উঠতো, তাদেরই একটি সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস হচ্ছে এই আন্দোলন। তা দেশের কৃষকের নামে চালানো অন্যায়। আন্দোলনের নামে অসত্য ও অর্ধসত্য বিবৃতি দেওয়াও অপরাধ।

বিরোধীদের জবাবে কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছিলেন এই বিল চাষিকে বীজ বোনার সময়েই ফসলের দামের গ্যারান্টি দেবে। বিক্রয় চুক্তি কেবলমাত্র উৎপাদনের উপর, তার সঙ্গে কৃষিজমির কোনো উল্লেখ নেই। কৃষক চুক্তি থেকে সরে আসতে পারে, ব্যবসায়ী পারবে না, কৃষক ও তার কৃষিজমি পুরোপুরি সুরক্ষিত। তিনি বিরোধীদের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন, কোনোদিনই কি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইনের অঙ্গ ছিল? কংগ্রেস তো ৫০ বছর শাসন করেছে। তারা কেন এতদিন তা আইনের অঙ্গীভূত করল না? বিরোধীরা কৃষিবিলকে রাজনৈতিক ইস্যু করেছে, যেহেতু এই বিলের বিরুদ্ধে সমালোচনার আর কোনো জায়গা নেই। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সবসময় ভারত সরকারের একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তই ছিল এবং থাকবে। নতুন আইনে কৃষক দেশ জুড়ে যে কোনো কৃষিজ পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। এই আইন কৃষককে পণ্য বিক্রির সুযোগ বাড়াতে সহায়তা দেবে। মান্ডি বা কৃষি-বাজারে যেভাবে কৃষকেরা আর্থিকভাবে শোষিত হয়, মানসিকভাবে প্রতারিত হয়, তা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি করবে এই বিল। আন্দোলনকারীরা নাছোড়বান্দা। সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বারে বারে কথা বললেও, তারা আসলে সমাধান তারা চাইছেন না। দেশে আন্দোলনের নামে অস্থিরতা জিইয়ে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই প্রশ্ন উঠেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আন্দোলনকে হাইজ্যাক করেছে কিনা। যে দাবি মঞ্চে খালিস্তানপন্থী, নকশালবাদী, উগ্র কাশ্মীরি, শাহিনবাগ এবং ভারতবিরোধী মুসলমান নেতাদের দেখা যায়! যে আন্দোলন চলাকালীন স্লোগান ওঠে— 'মোদী তেরি কবর খুদেগী, আজ নেহি তো কাল!' ইন্দিরাকো ঠোক দিয়া, মোদী কেয়া হ্যাঁয়!' 'পাকিস্তান হামারা দুশমন নেহি হ্যায়, দিল্লি হামারা দুশমন হ্যায়!' 'কৃষি বিল ইজ অ্যান্টি শিখ!' সেখানে যাবতীয় আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হয় বৈকি! কৃষিবিল নিয়ে এই কট্টর বিরোধিতা কেনই বা কেবলমাত্র পঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মতো স্থানে জন্ম নিল! কেনই বা অবশিষ্ট ভারতে বাদ গেল? কেন যে অঞ্চলের মানুষ আন্দোলন করলেন, তাদের গড় পারিবারিক আয় অন্য রাজ্যগুলি থেকে অনেক বেশি।

দেখা যাচ্ছে কিছু মানুষকে ভাড়া করে সামনে এগিয়ে দিয়েছে আর একদল মানুষ! দামী গাড়ি ও এলাহি আয়োজন নিয়ে উপস্থিত হওয়া মানুষ আসলে কারা? তারা কতশত বিঘা জমির মালিকানা ভোগ করেন? তারা কোনো মান্ডির আড়তদার? তারা কোনো বাজার কমিটিতে জাঁকিয়ে বসে থাকা রাজনৈতিক দলের প্রতিভূ? এসব চালচিত্র খুঁটিয়ে দেখতে হবে। খুঁজতে হবে বৈদেশিক যোগাযোগের তথ্যতালাশ। তখনই আবিষ্কার হবে এক অভূতপূর্ব ষড়যন্ত্রের আখ্যান, দেশবাসী নিশ্চিত।

তারপর যারা কৃষককে সম্মান দিতে জানেন না, তাদের কী হবে? প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির মতো ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্প কেন চালু করেনি পশ্চিমবঙ্গ? তাতে কেন এ রাজ্যের চাষিরা বঞ্চিত হচ্ছেন? দেশবাসীর নজরে কিন্তু নেই, এ রাজ্যের সত্তর লক্ষ কৃষকের বছরে ছয় হাজার টাকা পাবার সুবিধা অধরাই থেকে যাচ্ছে। সারা দেশের কৃষক যেখানে বারো হাজার টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে গেছেন, এ রাজ্যের চাষিরা তা আজও পেলেন না। কারণ রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে শামিল হয়নি। 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' বললে, আর যে পুজোই হোক, ভোটপুজো চলে না। ব্যাঙ্কে টাকা সরাসরি গেলে কাটমানির সুযোগ মেলে না, মানুষের অভিজ্ঞতা এমনতরো। তাই কী রাজ্য সরকার চাইছে, তাদের মাধ্যমে কৃষককে টাকাটা দিতে হবে? এতবড়ো বঞ্চনার বিচার কবে হবে? কে কবে করবে এর বিচার? ❑

কৃষক আন্দোলনে বামপন্থীদের সমর্থন বাস্তুঘুঘুদের হয়ে ওকালতি

ড. সৌমেন ঘোষ

বামফ্রন্ট যখন ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসে তৎকালীন বামফ্রন্টের সম্পাদক কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে তারা 'বাস্তুঘুঘুদের বাসা ভাঙো' স্লোগান তুলেছিল। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে জোতদার-রাজের অবসান করে, ক্ষুদ্র প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদেরকে সংগঠিত করে জোতদার বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের চিরস্থায়ী ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তোলা। ভাগচাষিদের এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিকানা স্বত্ব দান, অপারেশন বর্গা, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার বা উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের পাইয়ে দেওয়া ইত্যাদি ডঙ্কানিনাদ বাজিয়ে কৃষকবন্ধু ভাবমূর্তি গড়ে তুলে গ্রামবাঙ্গলায় সিপিএম তাদের শক্তপোক্ত লাল দুর্গ গড়ে তুলতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছিল। যদিও এই বন্ধুত্বে কতটা কৃষকপ্রেম ছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ পরবর্তীকালে অনেক গবেষণাতেই প্রমাণিত হয় যে বাঙ্গলার অল্পসংখ্যক জমিই কৃষকদের মধ্যে পাট্টা হিসেবে বিলি করা হয়েছিল। আবার যেটুকু জমি বিলি করা হয়েছিল বামফ্রন্টের দীর্ঘ রাজত্বে অনেক প্রান্তিক ও ছোটো চাষি সেই জমি ধরে রাখতেও ব্যর্থ হয়। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার প্রারম্ভিক পরে এই সমস্ত গালভরা কর্মসূচি দ্বারা যত না কৃষকদের উন্নয়ন ঘটিয়েছে তার চেয়ে বেশি গ্রামীণ এলাকায় সিপিএম তাদের শক্তিকে মজবুত করেছে। প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ বাম নেতৃবৃন্দ বুঝেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার মৌরসিপাট্টা ধরে রাখতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সমাজকে তাদের অনুকূলে রাখতে হবে। একথা মাথায় রেখে এই ধরনের গরিব কৃষক দরদি পদক্ষেপ করে সিপিএম এরাজ্যে তাদের ম্যারাথন সাফল্যের নিদর্শনস্বরূপ প্রায় সাড়ে তিন দশক ক্ষমতা ভোগ করেছে। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে এই পঞ্চায়েতগুলি ছিল সিপিএমের দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের আঁতুড়ঘর। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ও তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র স্থাপনের নামে পঞ্চায়েতগুলি সিপিএমের ভোট ক্যাপচারিং মেশিনে পরিণত হয়েছিল। পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে শুরু করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো ব্যক্তিগত বিষয়েও পঞ্চায়েতগুলির হস্তক্ষেপ শুরু হয় আর এভাবেই সিপিএম গ্রামবাঙ্গলাকে লাল দুর্গে পরিণত করে। গ্রামবাঙ্গলায় স্থাপিত হয় এমন একটি পরিবেশ যেখানে সিপিএমের ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়তে পারবে না। আর যে সমস্ত কৃষক পরিবার সিপিএমের কাছে

শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য সর্বভারতীয় চরিত্রবিহীন কতিপয় স্বার্থান্বেষী আঞ্চলিক স্তরের কৃষকদের আন্দোলনকে বামপন্থীরা বড়ো করে তুলে ধরার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে তারা যেভাবে বৃহৎ কৃষক ও জোতদার শ্রেণীর ওকালতি করছে তা জাতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের আবার একবার হাস্যস্পদ করে তুলবে।

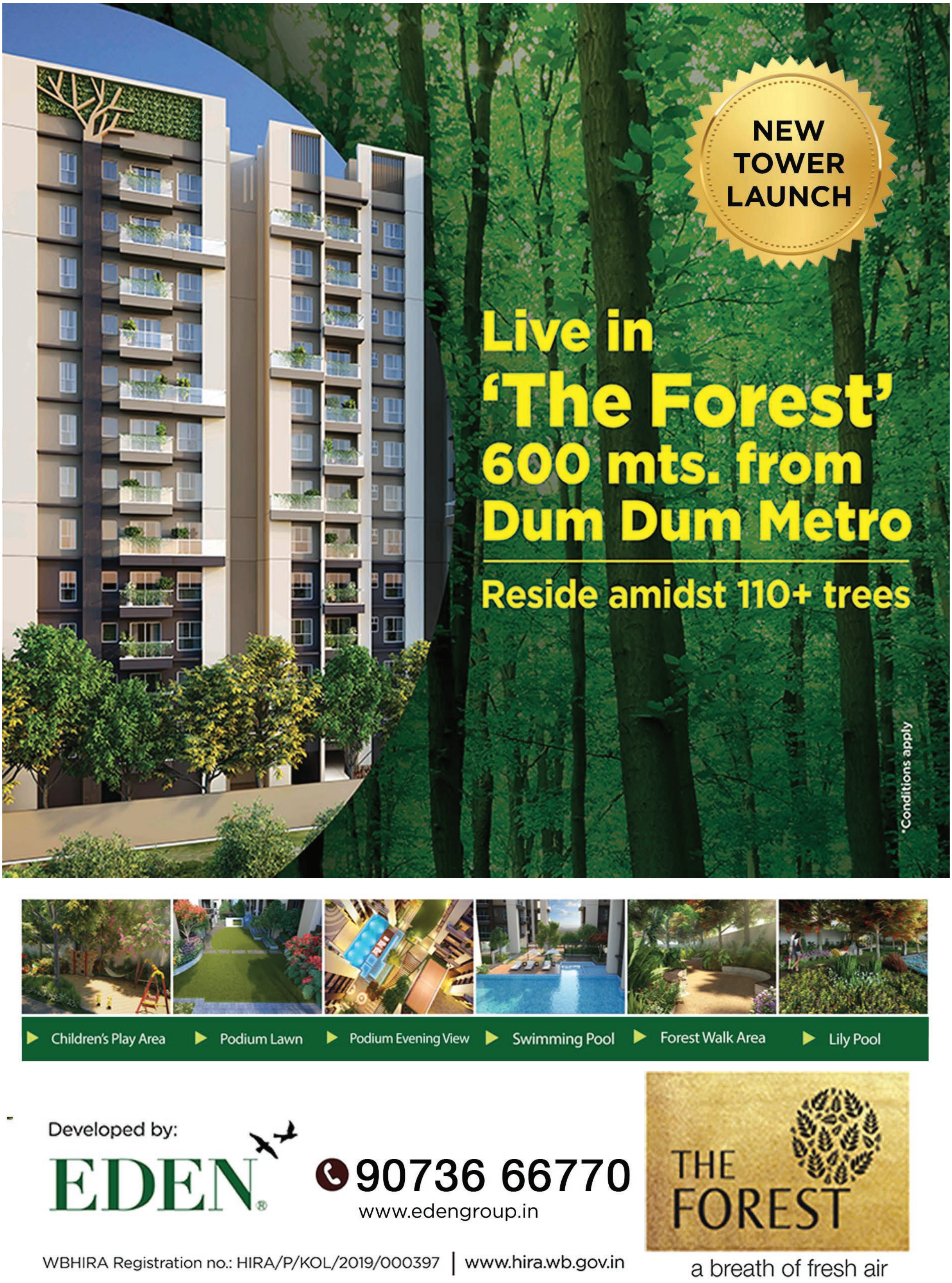
NEW TOWER LAUNCH
Live in 'The Forest'
600 mts. from Dum Dum Metro
Reside amidst 110+ trees
*Conditions apply
Children's Play Area
Podium Lawn
Podium Evening View
Swimming Pool
Forest Walk Area
Lily Pool
Developed by:
EDEN
90736 66770
www.edengroup.in
THE FOREST
a breath of fresh air
WBHIRA Registration no.: HIRA/P/KOL/2019/000397 | www.hira.wb.gov.in

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে পারলো না তাদের উপর নেমে আসে চরম প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নির্যাতন। এই সমস্ত বিরোধী ও প্রতিবাদী কৃষকদের চিরতরে অবদমিত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বিশেষত সিপিএম এদের উপর তাদের কিষান সভার সাংগঠনের সাহায্যে সামাজিক বয়কট বা লেবার স্ট্রাইকের মতো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হয়। এই সমস্ত কৃষকের জমির ফসল বাড়িতে আনতে না দেওয়া, জমিতে খেতমজুর লাগতে না দেওয়া প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করে পরিবারগুলোকে ভাতে মারার ব্যবস্থা করল বামপন্থীরা। পশ্চিমবঙ্গের যে কৃষক-খেতমজুরের চিরাচরিত আত্মিক সম্পর্ক ছিল, তা ধ্বংস করে দিল মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা কৃষক ক্ষেতমজুরের পারস্পরিক সম্পর্ক অচিরেই বিনষ্ট হলো সিপিএমের রাজনৈতিক সুবিধাবাদের কারণে। ঠিক যেমনভাবে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে শিল্পে অগ্রগণ্য রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে অন্তর্জলি যাত্রার পথ প্রশস্ত করেছিল ঠিক সেই ভাবে। ফলস্বরূপ গ্রামীণ জীবনে নেমে এল এক চিরস্থায়ী সংকট।

অন্যদিকে নিম্নবর্গ ও দরিদ্র মানুষ এবং নারীর ক্ষমতায়নের মতো বড়ো বড়ো তত্ত্বকথা বলে এই সমস্ত সম্প্রদায়কে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করিয়ে পার্টির নেতারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ করতে থাকল। জোতদার মহাজন খেদানোর কথা বলে নিজেরাই গ্রাম সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসল। দেখা গেল যে সহায়সম্বলহীন পার্টির ক্যাডাররা খুব অল্প সময়েই বহু সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠলো। গ্রাম উন্নয়ন, খেতমজুর কল্যাণ প্রভৃতির নামে প্রতিষ্ঠা হলো সিপিএমের ক্যাডার রাজ। অত্যন্ত সচেতন ভাবে ভূমিহীন প্রান্তিক ক্ষেতমজুরদের জমি পাট্টা হিসেবে বিলি করা হলেও তাদের হাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেওয়া হলো না কোনো বৈধ কাগজপত্র। যাতে তারা পার্টির কাছে মাথা নত করে থাকতে বাধ্য হয়। শ্রেণীশত্রু ও প্রতিক্রিয়াশীল তকমা দিয়ে কঠোরভাবে কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো। এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে কৃষিভিত্তিক গ্রামবাঙ্গলায় গরিব ও প্রান্তিক চাষিদের এক অর্থে জনমোহিনী ভাষার মায়াজালে আবদ্ধ করে এবং তাদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সিপিএম তাদের দীর্ঘকালীন কর্তৃত্ব এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই বাম বিরোধী শক্তির অক্ষমতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশেই দায়ী ছিল।

বামপন্থীরা চিরকালই জোরদার মজুতদার বড়ো চাষিদের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামের বাণী শুনিয়ে এসেছিল। আজ হঠাৎ জোতদারদের দালালিতে নেমে পড়েছে। আসলে এটাও বামপন্থীদের একটা ভণ্ডামি।

একথা সত্যি যে এই সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে এরাজ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকার বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু একই সঙ্গে শেষ করে দিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রথম সারির এই রাজ্যটির উন্নয়নের ধারাকে। তাই পরবর্তী বিভিন্ন গবেষণায় যে চিত্র উঠে আসে তাতে দেখা যায় ভূমি সংস্কারের ফলে প্রাপ্ত জমি কৃষকদের অনেকেই ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। গড় মাথাপিছু আয়, গড় পুষ্টির হার, শিক্ষা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রাজ্যের গ্রাফ নিম্নমুখী হতে থাকে। বিকল্প জীবিকার তাগিদে চিরাচরিত কৃষিভিত্তিক পেশা ছেড়ে এরাজ্যের যুবসমাজ পাড়ি জমাতে থাকে অন্যান্য রাজ্যে। নতুন প্রজন্মের যুব সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক চরম হতাশা। এরকম এক প্রেক্ষাপটে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে ২০১১ সালে।

পরবর্তীকালে পঞ্চায়েত, লোকসভা, বিধানসভা সকল নির্বাচনে বামপন্থীদের ধারাবাহিক রক্তক্ষরণ প্রমাণ করে গ্রামীণ সমাজে গ্রামোন্নয়ন ও কৃষকপ্রেমী স্লোগান কত বড়ো শূন্যগর্ভ ছিল। জনসমাজ ও জনসমর্থন থেকে বিচ্যুত ব্রাত্য বামপন্থীরা কোনো প্রকারে তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও তাদের ডাকে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সাড়া মিলছে না । এরকম অবস্থায় কেন্দ্র সরকার যখন নতুন কৃষি বিল প্রণয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও সাধারণ চাষিদের স্বার্থ রক্ষা এবং ফড়ে ও মহাজনদের হাত থেকে তাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছে, তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই নতুন কৃষি আইন যে সমস্ত কায়েমি স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের আঘাত করছে তারা যথারীতি প্রতিবাদ শুরু করেছে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলি থেকে কৃষকরা কেন্দ্র সরকারের এই কৃষি নীতি 'তাদের স্বার্থ বিরোধী ও কর্পোরেট জগতের স্বার্থে রচিত' অভিযোগ তুলে দিল্লির সন্নিকটে আন্দোলন শুরু করেছে। অবরোধ করে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক। এই সুযোগে বামপন্থীরা এই কৃষকদের আন্দোলনের অন্যতম সহযোগী এবং স্বনিযুক্ত অভিভাবকের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তারা এ বিষয়টির জন্য প্রচার, পথসভা এবং বিশেষত গণমাধ্যম ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিতে অবিরাম প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অন্নদাতা কৃষকদের উপর ফ্যাসিবাদী কেন্দ্র সরকারের আক্রমণ ইত্যাদি অপপ্রচার করে কেন্দ্র

সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো বামপন্থীরা যে কৃষকদের সমর্থনে আওয়াজ তুলছে তারা কারা? এরা কি সম্বলহীন সাধারণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি? কখনোই না। এরা পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানের বিত্তবান কৃষক যারা শত শত একর জমির মালিক এবং যাদের হাতে কৃষিপণ্যের লাইসেন্স, মজুতদারি ও অন্যান্য বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকার বর্তমান। সারা দেশের কৃষি উৎপাদনের একটা সিংহভাগ এদের হাতে। কেন্দ্র সরকারের বর্তমান কৃষি নীতি যা গরিব কৃষকদের ফড়ে ও মহাজনদের থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক ভাবেই এই সমস্ত মুষ্টিমেয় শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকূলে গিয়েছে। ফলত তারা কেন্দ্র সরকারের কৃষি নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে এতদিনের মৌরসিপাট্টা এবার বন্ধ হয়ে যাবে। কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তাই তারা সমবেতভাবে দিল্লি সীমান্তে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য সমবেত হয়েছে। নিজেদের জন্য আগামী চার মাসের রসদ মজুত করে জাতীয় সড়ক অবরোধের মাধ্যমে জনজীবনকে রুদ্ধ করতে চাইছে। যদিও বলা হচ্ছে এই আন্দোলন অরাজনৈতিক, কিন্তু এই আন্দোলনে বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানি, মাওবাদী জঙ্গিগোষ্ঠী ও বিবেচনাহীন বিরোধী দলগুলি এবং প্রাসঙ্গিকতা হারানো বামপন্থীরা মদত জোগাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মনে রাখতে হবে, পঞ্জাব, হরিয়ানার কৃষকরা ভারতের কৃষিপণ্যের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। এদের হাতে পড়ে ভারতের গরিব প্রান্তিক,ক্ষুদ্র ও সাধারণ কৃষকরা প্রায় সকল সুযোগসুবিধা থেকেই বঞ্চিত। ভরতুকির মতো সরকারি সুবিধার অধিকাংশই এই বৃহৎ কৃষকরা ভোগ করে থাকে এবং তার ছিঁটেফোঁটা অংশই গরিব কৃষকদের হাতে এসে পৌঁছায়। মান্ডিগুলিতে ফসল কেনার একচেটিয়া পারমিট এবং অধিকার থাকায় তারা নির্দ্বিধায় সাধারণ কৃষককে শোষণ করে দীর্ঘকাল ধরেই নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি করে আসছিল। আর্থিক সংস্থান না থাকার কারণে গরিব কৃষকদের বড়ো মহাজনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এদের কাছে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে তারা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে ফসল বিক্রির সময় তাদের সুযোগসন্ধানী ফড়েদের পাল্লায় পড়তে হয়। ফলে উভয়দিক থেকেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা শোষণের শিকার হয়ে আসছিল। বর্তমান কৃষিনীতি তাদের হাতে এনে দেবে অনেকগুলি বিকল্প সুযোগ। ফসল বিক্রিতে চুক্তি সম্পাদন দর কষাকষি ও পছন্দসই বাজার অনুসন্ধানের সুযোগ তারা পাবে। এই সঙ্গে সরকারি সাহায্যের নিশ্চয়তাও মিলবে। সুতরাং কেন্দ্র সরকারের নতুন কৃষিনীতি যদি তাদের জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনে বা তাদের অধিকার সুরক্ষায় পথ দেখায় তা অবশ্যই তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে যা আগে কখনই হয়নি। বড়ো কৃষক নতুন আইন যাদের বাড়াভাতে ছাই দিয়েছে তারা সংগত কারণেই বিরোধিতা করবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এদের পক্ষে বামপন্থীদের সমর্থন জানানোর বিষয়টি। যখন কেন্দ্র সরকার নতুন কৃষি আইনের মাধ্যমে এই বাস্তুঘুঘুদের বাসা ভাঙতে চাইছে তখন এই আইনের বিরোধিতা করে বামপন্থীরা সেই বাস্তুঘুঘুদেরই সমর্থন করছেন? যে বামপন্থীরা চিরকালই এই জোরদার মজুতদার বড়ো চাষিদের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামের বাণী শুনিয়ে এসেছিল, আজ হঠাৎ জোতদারদের দালালিতে নেমে পড়ল। আসলে ভণ্ডামিতে বামপন্থীদের কোনো বিকল্প নেই। তারা চিরকাল মুখে গরিব ও কৃষক দরদের কথা বললেও প্রকৃত কৃষকদরদি এই কৃষি বিলের তাদের এই বিরোধিতা চরম দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য দ্বিচারিতা বামপন্থীদের কাছে নতুন কিছু নয়। বহু ক্ষেত্রেই তারা দেশবিরোধী কাজ করে এসেছে। সে দেশভাগের সময় মুসলিম লিগকে সমর্থন হোক বা বাষট্টির চীনা আক্রমণে চীনকে সমর্থনই হোক। তাদের পক্ষে এটা নতুন কিছু নয়। শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য সর্বভারতীয় চরিত্রবিহীন কতিপয় স্বার্থান্বেষী আঞ্চলিক স্তরের কৃষকদের আন্দোলনকে বামপন্থীরা বড়ো করে তুলে ধরার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে তারা যেভাবে বৃহৎ কৃষক ও জোতদার শ্রেণীর ওকালতি করছে তা জাতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের আবার একবার হাস্যস্পদ করে তুলবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ▯

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

ভারতের শিক্ষানীতি ২০২০

উন্নত ভারতের দিক্‌নির্দেশ

রবি রঞ্জন সেন

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে অনেক শিক্ষা কমিশন, কমিটি গঠন হয়েছে অথচ আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক কাঠামো থেকে মুক্ত করে ভারতকেন্দ্রিক শিক্ষা গড়ার কাজকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারিনি। ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতির পর দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে ভারতে আর কোনো নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। ইতিমধ্যে পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে, অনেক নতুন বিষয় এসেছে, নতুন প্রযুক্তি এসেছে, এসেছে নতুন চিন্তাভাবনা। ২০১৭ সালে ইসরোর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. কে কস্তুরী রঙ্গনের নেতৃত্বে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি কমিটি ভারত সরকার গঠন করে। এই কমিটি দুই বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে একবিংশ শতাব্দীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা নীতির খসড়া তৈরি করে ৩১ মে ২০১৯-এ তা সরকারের হস্তগত করে। এই সময়কালে এই কমিটি প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, বিদ্যার্থী, অভিভাবকদের থেকে মতামত সংগৃহীত করে। এত বৃহৎ আকারে মানুষের মতামত নিয়ে তার প্রত্যেকটির উপর বিচার-বিমর্ষ করে দেশের শিক্ষানীতি নির্ধারণ ইতিপূর্বে কোথাও হয়নি। এই কমিটির প্রতিবেদনই গত ২৯ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট দ্বারা অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হলো জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ রূপে।

ঘোষণার পর থেকেই এই নীতির বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে সমস্ত মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। প্রায় সকলেই এই নীতিকে অত্যন্ত ইতিবাচক ও ভবিষ্যদ্‌মুখী দিকনির্দেশ

হিসেবে স্বাগত জানিয়েছে যদিও কিছু রাজনৈতিক ও অন্যান্য মহল থেকে সমালোচনাও শোনা গেছে। তবে অধিকাংশ শিক্ষাবিদদের মত অনুসারে এই নীতি একদিকে ভারতের সনাতন ঐতিহ্য, তার জ্ঞান পরম্পরা, তার মূল্যবোধ ও চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ও এই সমস্ত বিষয়গুলিকে পঠনপাঠনের অন্তর্ভুক্ত করছে। অপরদিকে নতুন বিশ্বায়িত জগতের সঙ্গে তাল রাখার জন্য যে ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পরিকাঠামো ও পাঠ্য বিষয়সমূহের প্রয়োজন সেগুলিকেও শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সত্যের আদর্শকেই নীতির সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। নীতির খসড়ার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাচীন ও সনাতন ভারতীয় জ্ঞান ও চিন্তা এই নীতি নির্ধারণে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে। প্রাচীন ভারতের তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, বল্লভির উল্লেখ, চর্চা এবং সেই জ্ঞানকেন্দ্রগুলির থেকে শেখার কথা এই নীতির মধ্যে বারবার উঠে এসেছে। মৈত্রেয়ী, গার্গী থেকে শুরু করে ভারতীয় বিদ্বান ও বিদূষীগণের উল্লেখও করা হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থার এই মৌলিক সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে শিক্ষককে রাখা হয়েছে। কারণ যে কোনো শিক্ষানীতির সাফল্যের চাবিকাঠি শিক্ষকসমাজের হাতে। শিক্ষকরাই সমাজজীবনে সবচাইতে সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন কারণে এই সামাজিক সম্মান হ্রাসমান। এই নীতি শিক্ষকদের পুনরায় সেই সম্মানের স্থানে বসানোর কথা বলে ও তাঁদের সশক্তিকরণের কথা বলে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরেই শিক্ষকদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ, প্রস্তুতি ও কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সঠিক পরিকাঠামো প্রদানের কথা বলে। আর তাই বি.এড-কে স্নাতক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে একত্রিত করে চার বছরের কোর্সে পরিণত করা হচ্ছে। এছাড়াও স্পষ্টভাবে বলা আছে যে পড়ানো ছাড়া অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় দায়িত্ব বিশেষ করে নির্বাচনের দায়িত্ব শিক্ষকদের দেওয়া যাবে না।

ছাত্রদের জন্য সর্বস্তরে উন্নত গুণমানের শিক্ষার অঙ্গীকার এই শিক্ষানীতির মধ্যে আছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রকৃত মানুষ নির্মাণ এবং এই আদর্শের আলোকেই যে এই নীতি প্রস্তুত করা হয়েছে তা খসড়ার প্রথমেই বলা হয়েছে। সমগ্র পাঠ্যক্রম ও পঠনপাঠনের মাধ্যমে এই দেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়াও শিক্ষাব্যবস্থা যাতে 'লেভেলার' রূপে কাজ করতে পারে অর্থাৎ সকল শ্রেণী, জাতি, অঞ্চল প্রভৃতি ভেদাভেদ নির্বিশেষে যাতে সকল ছাত্র-ছাত্রীর সমান ধরনের উচ্চগুণমান-সম্পন্ন শিক্ষা দেওয়া যায় তার কথা এই নীতির মধ্যে আছে। তাই এখানে স্পষ্ট বলা আছে যে, এই নীতির সমস্তটাই সরকারি ও বেসরকারি উভয়

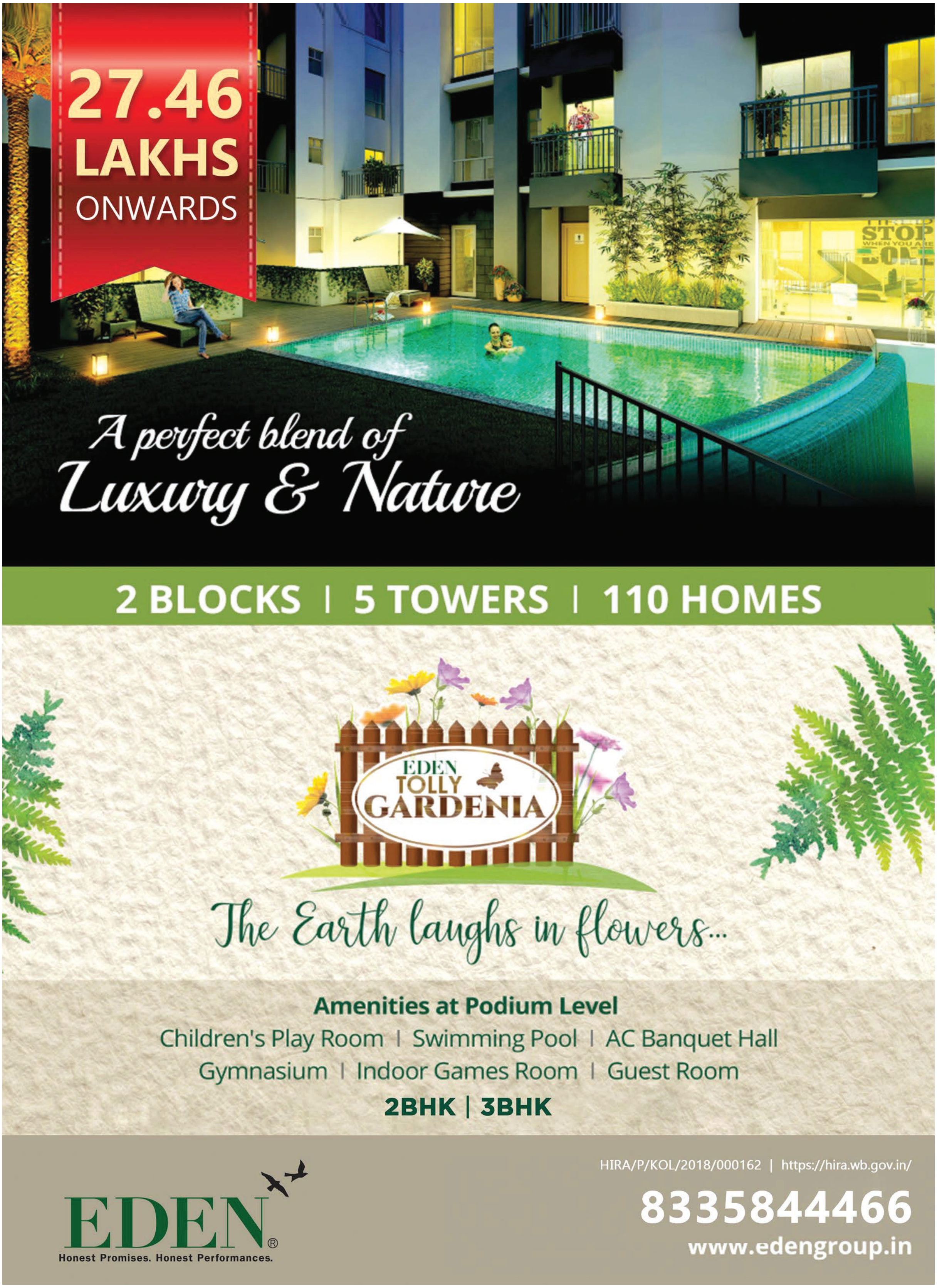

27.46
LAKHS
ONWARDS
A perfect blend of
Luxury & Nature
2 BLOCKS | 5 TOWERS | 110 HOMES
EDEN
TOLLY
GARDENIA
The Earth laughs in flowers...
Amenities at Podium Level
Children's Play Room | Swimming Pool | AC Banquet Hall
Gymnasium | Indoor Games Room | Guest Room
2BHK | 3BHK
HIRA/P/KOL/2018/000162 | https://hira.wb.gov.in/
EDEN®
Honest Promises. Honest Performances.
8335844466
www.edengroup.in

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। ইতিপূর্বে আমরা দেখে অভ্যস্ত যে, সমাজের উচ্চবিত্তদের ছেলে-মেয়েদের জন্য একধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বেসরকারি কনভেন্ট ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘিরে এবং সাধারণদের জন্য আরেক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা সরকারি স্থানীয় ভাষামাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে। এই বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে দূর করার কথা এই নীতির মধ্যে আছে।

সকল শিশুর জন্যই তিন বছর বয়স থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের পর্ব শুরু করার কথা বলা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর পূর্বের এই তিন বছর, শিশুকে বিভিন্ন খেলা ও খেলনার মাধ্যমেই শিক্ষার ভিত স্থাপন করা হবে। এই সময়ে শিশুর পুষ্টি ও শারীরিক বিকাশের উপরও জোর দেওয়া হবে। মিডডে মিল ছাড়াও প্রাত্যহিক পুষ্টিকর জলযোগের ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে ৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এর আওতা বৃদ্ধি করে ৩-১৮ পর্যন্ত করা হয়েছে এবং বিদ্যালয় স্তরকে ভাগ করা হয়েছে ৫+৩+৩+৪ অর্থাৎ চারটি পর্যায়ে। শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশের ৮৫ শতাংশ আট বছর বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তাই এই সময়েই নতুন ভাষা শেখা তার পক্ষে সহজ হয়। তাই এই নীতিতে প্রথম থেকেই ত্রিভাষা সূত্রের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ মাতৃভাষা/স্থানীয় ভাষা ছাড়াও আরও দুটি ভাষা শেখানো হবে যার চয়ন নির্ভর করবে রাজ্য সরকার ও ছাত্রদের উপর। সারা বিশ্বের অধিকাংশ গবেষণাই আমাদের জানাচ্ছে যে, শিশুদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো পঠনপাঠন হয় নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে। তাই এই নীতিতে বলা হয়েছে যে অন্তত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং সম্ভব হলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষা হবে। আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে এই নীতি সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। বলা বাহুল্য, মাধ্যম মাতৃভাষা হলেও অন্য কোনো ভাষা ভালোভাবে শেখার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, বরং তিনটে ভাষাই, যার মধ্যে অন্তত দুটি ভারতীয় ভাষা রাখতে হবে, ভালোভাবে শেখা বাধ্যতামূলক হবে।

ভারতের জ্ঞানপরম্পরা স্পর্শ করার মাধ্যম সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃতের চর্চা প্রোৎসাহিত না করলে এই বিশাল ও সমৃদ্ধ জ্ঞানপরম্পরা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল, আর যদি তা হয় তাহলে শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র মানবসভ্যতার ক্ষতি। তাই সংস্কৃতশিক্ষাকে সর্বস্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে ত্রিভাষা সূত্রের একটি বিকল্প ভাষা হিসেবে। অবশ্য কোনো ভাষাকেই বাধ্যতামূলক করা হয়নি, বলা হয়েছে সংস্কৃত বিকল্প হিসেবে থাকা বাধ্যতামূলক কিন্তু সেটাকে চয়ন করার বা না করার স্বাধীনতা ছাত্রের। এছাড়াও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে ‘ভারতের ভাষা’ নামক একটি পাঠ্যক্রম থাকবে যেখানে ভারতের সমস্ত ভাষা, তাদের উৎস ও সাহিত্যসম্ভার সম্বন্ধে শেখা যাবে এবং সব ভাষায় প্রাথমিক কিছু বাক্যবিনিময় শেখানো হবে। সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে প্রোৎসাহিত ও বিকশিত করার জন্য বলা হয়েছে যে প্রাথমিক থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত পেশামূলক ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা-সহ সকল শিক্ষাই ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ হবে ও বিশ্বের সাম্প্রতিকতম গবেষণাগুলিকে সব ভাষায় অনুবাদ করার জন্য একটি উন্নতমানের সংস্থা গঠন করা হবে। এই সদর্থক নীতির ফলে আশা করা যায় যে অল্পসংখ্যক ইংরেজি বলা মানুষের বাইরে যে বিপুল প্রতিভাসম্ভার আমাদের দেশে সুযোগের অভাবে লুকিয়ে আছে, সেই সমস্ত প্রতিভাগুলিকে বিকশিত করতে ও সামনের সারিতে আনতে এই নীতি ফলপ্রসূ হবে।

তবে এই শিক্ষানীতির সমস্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে মূলকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে মূল শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যাবে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের পেশার থেকে শিক্ষাব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শুধু কেরানি তৈরি করা, তার রেশ স্বাধীনতার এত বছর পরও রয়ে গেছে। এর ফলেই আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের সমস্যা এত অধিক। এই বস্তাপচা চিন্তাভাবনাকে অবশেষে বিসর্জন দিয়ে আমরা আমাদের শিক্ষাকে মানুষের পেশার সঙ্গে যুক্ত করতে চলেছি। কামার, কুমোর, ছুতোর, কৃষক, মালী, বিদ্যুৎ মিস্ত্রী প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত দক্ষ কারিগরদের থেকে যে কোনো একটি বৃত্তিমূলক পেশা শিখে পারদর্শী হবার সুযোগ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দেওয়া হবে। এতে আমাদের যুবসমাজের জন্য স্বরোজগারের

এই শিক্ষানীতি শিক্ষকদের প্রকৃত যোগ্যতানুযায়ী কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অনুসরণ করে শিক্ষকদের মর্যাদাকে গুরুত্ব সহকারে সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রথম হস্তশিল্পী, কৃষক, তন্তুবায়-সহ চিরাচরিত বিভিন্ন পেশার মানুষকে শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁরা এখন থেকে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার স্কুলে ক্লাস নিতে পারবেন।

— ড. বিপ্লব লোহচৌধুরী
বিভাগীয় প্রধান, সেন্টার ফর
জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
শান্তিনিকেতন

ফঃ ৫

পথ খুলে যাবে ও তার সঙ্গে স্কুলছুটের হারও হ্রাস পাবে। কারণ স্কুলে প্রাপ্ত শিক্ষা নিজেদের জীবন, জীবিকা ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বোধ হবে। আবার যারা বিষয় হিসেবে বৃত্তিমূলক পেশা বেছে নেবে না সেই ছাত্র-ছাত্রীদেরও অন্তত দশ দিন বাধ্যতামূলকভাবে কোনো একটি পেশার মানুষের কাছে তাদের কাজ সম্বন্ধে শিখতে হবে। অর্থাৎ এই নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে ডাক্তার, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ারদের ছেলে-মেয়েরাও অন্তত কটাদিন এই কামার, কুমোরদের সঙ্গে কাটাবে, তাদের পেশা সম্বন্ধে জানবে, অনুভব করতে শিখবে যে এই সমস্ত কাজেও কেবল কায়িক শ্রম নয়, কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই শিক্ষা যেমন একদিকে সমাজজীবনের সমগ্রতা সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা দেবে, তেমনই সমস্ত পেশার গুরুত্ব বুঝতে ও সেই মানুষগুলিকে যথেষ্ট সম্মান করতেও শেখাবে। সামাজিক সাম্যের আদর্শকে রূপায়তি করতে এই পদক্ষেপের পরিণাম সুদূরপ্রসারী হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

এই নীতির আরেকটি বহু চর্চিত প্রস্তাব হলো বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের মধ্যে ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙে দেওয়া। একদিকে মূল শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাচীর ভেঙে যাচ্ছে। অপরদিকে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য এই পৃথক পৃথক ধারাগুলির মধ্যেও বিভাজনের প্রাচীর ভাঙতে চলেছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে এবং উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণেও বিদ্যার্থীরা সমস্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে তাদের পছন্দমতো বিষয়সমূহ বেছে নিতে পারবে। অর্থাৎ কেউ পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সংস্কৃত পড়তে চাইলে পড়তে পারবে, ইতিহাসের সঙ্গে জীববিদ্যা পড়তে চাইলেও তা পারবে। তার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত, চারুকলা ও ক্রীড়াকেও পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত 'একস্ট্রা' বিষয় হিসেবে না দেখে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোনো বিষয়ের সঙ্গে সমান গুরুত্বসহকারে রাখা হয়েছে। বিষয় চয়নের এই বিস্তার ও স্বাধীনতা যেমন পছন্দমতো বিষয় নিয়ে পড়াশোনার করার ও ছাত্রের ভবিষ্যত জীবনপথ গঠন করার স্বাধীনতা প্রদান করবে সেরকমই বিভিন্ন ধরনের প্রতিভাকে প্রোৎসাহিত করে আমাদের সমাজের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করবে। এতদিন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সকলকে এক ধাঁচে গড়ে তোলার যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো তারই ফলে এদেশে এত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও আমরা অত্যাধুনিক গবেষণার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিলাম, উদ্ভাবনশক্তি বিকাশের বদলে গতানুগতিককেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছি, এর পরিণাম হিসেবে প্রযুক্তির উৎপাদক না হয়ে ভোক্তায় পরিণত হয়েছি। এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের দরবারে আমাদের প্রযুক্তির উৎপাদক রূপে দাঁড় করানোর একটা প্রয়াস আমরা এই শিক্ষানীতির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

বৃত্তিমূলক বিষয়ের ক্ষেত্রেই হোক অথবা সাধারণ বিষয়ের পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেই হোক, এই শিক্ষানীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আঞ্চলিক ও স্থানীয় জ্ঞানপরম্পরাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছে। বলা হয়েছে বৃত্তিমূলক বিষয়ের চয়ন সেই অঞ্চলের ঐতিহ্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী হবে এবং পাঠ্যক্রমের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে স্থানীয় লৌকিক জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অর্থাৎ স্থানীয় কৃষক, মৎস্যজীবী প্রভৃতির যুগ যুগ ধরে চলে আসা বৃত্তিমূলক জ্ঞানকে প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে তার সঙ্গে জনজাতীদের মৌখিক জ্ঞানপরম্পরা বিশেষ করে ভেষজ চিকিৎসার ক্ষেত্রে, পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় ও লৌকিক জ্ঞানের সঙ্গে আজকের বিশ্বের অত্যাধুনিক বিষয়সমূহ যেমন কোডিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ৩-ডি ও ৭-ডি ডিজাইন, ন্যানোপ্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এতটাই যে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কোডিং শেখানোর কথা বলা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের ভালো নাগরিক হবার জন্য যে সমস্ত বিষয়ে সচেতনতা দরকার যেমন পরিবেশ রক্ষা ও জৈব প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতিও পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহুবিষয়ভিত্তিক হবে অর্থাৎ কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্য- কৃষি- মেডিক্যাল- ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি সকল বিষয়ই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হবে। বিএড-এর কোনা পৃথক প্রতিষ্ঠান থাকবে না, বরং বহুবিষয়ভিত্তিক কলেজেই তা পড়ানো হবে।

উচ্চশিক্ষাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য হাইয়ার এডুকেশন কমিশন অব ইন্ডিয়া গঠনের প্রস্তাব করা করা হয়েছে। এই সংস্থানের অধীনে অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থান পাঠ্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয় ও সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দেখাশোনা করবে। গবেষণাকে প্রোৎসাহিত করতে ও তার গুণমান উন্নত করতে একটি ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন গঠন করা হবে। এই প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করতে হলে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। বেসরকারি দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য ব্যয় করতে প্রোৎসাহিত করা হবে, যদিও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রোধ করার ব্যবস্থাও বলা হয়েছে। আবার সরকারি ব্যয় প্রচুর বৃদ্ধির সুপারিশও রয়েছে। মোট দেশীয় উৎপাদনের ৬ শতাংশ (যা বর্তমানে ৪.৪৩ শতাংশ) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষাখাতে মিলিত ব্যয় হওয়া উচিত বলে স্পষ্ট পরামর্শ করা হয়েছে।

এই শিক্ষানীতি যদি সঠিকভাবে রূপায়িত হয় তবে ভারতবাসী হিসেবে আমরা নিজস্ব জাতীয় পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেই একবিংশ শতাব্দীর উন্নত দেশের তালিকায় প্রবেশ করতে পারব। তারই দিকনির্দেশ এই নীতি করেছে। তবে এর জন্য সমস্ত রাজনৈতিক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সব রাজ্য সরকার, শিক্ষা প্রশাসকগণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিদদের এগিয়ে এসে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে এর বাস্তবায়ন করতে হবে। তা যদি আমাদের দ্বারা সম্ভবপর হয় তাহলে ভারত আবার সারা বিশ্বে শিক্ষার এক উজ্জ্বল কেন্দ্র হয়ে উঠবে এবং 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' এই স্বপ্নকে আমরা অদূর ভবিষ্যতেই সাকার রূপ প্রদান করতে সক্ষম হব।

(লেখক সহযোগী অধ্যাপক, কাটোয়া মহাবিদ্যালয়)

মগজ ধোলাইয়ে মৃতপ্রায় বাঙ্গালিকে অক্সিজেন জোগাবে জাতীয় শিক্ষানীতি

ড. তরুণ মজুমদার

দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত শিক্ষিত বাঙ্গালির কাছে শিক্ষা যখন কেরানি সৃষ্টির নামান্তরে পর্যবসিত হয়েছিল ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে স্বামীজীর শিক্ষা-চিন্তন এক নতুন দিশা দেখিয়েছিল। স্বামীজীর মতে, 'যে অনুশীলন দ্বারা ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে এবং ফলপ্রসূ হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা।' তিনি বলেন কেউ কাউকে কিছু শেখাতে পারে না। শিক্ষা উপলব্ধি বা জাগরণ ছাড়া আর কিছু নয়। যা করা যায় তা হলো উপলব্ধির পথে সহায়তা করা। অর্থাৎ স্বামীজীর মতে, বিভিন্ন জাগতিক বিষয়ে জ্ঞান ও কর্ম দক্ষতা অর্জন করে অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা লাভ করার সাথে সাথে লোক কল্যাণে ইচ্ছাসমুজ্জ্বল, বজ্রদৃঢ় দেবোপম চরিত্রের অধিকারী হয়ে ওঠাকেই শিক্ষা বলা যেতে পারে। আবার শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার নির্যাসও ঠিক একই দিকে ইঙ্গিত করে। রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কেরানি তৈরির বিরোধিতা করে

নয়া ব্যবস্থায় কোনো পাঠক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত হওয়া বা সেই পাঠক্রম থেকে বেরিয়ে আসার সংস্থান থাকায় তা ঘুরিয়ে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রেও স্বামীজীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি মনে করতেন গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শিক্ষার কাছে পৌঁছতে না পারে তাহলে শিক্ষাকে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

সৃজনশীলতার প্রকাশের মাধ্যমে পূর্ণ মানুষ তৈরির কথা বলেছেন। আর ঠিক এখানেই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি এই দুই মনীষীর শিক্ষা ভাবনার সাথে হুবহু মিলে যায়। স্বাধীনতার পর এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের চিন্তন অনুসরণ করে শিক্ষকদের সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে তাঁরা এখন থেকে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার স্কুলে ক্লাস নিতে পারবেন। জ্ঞান সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্লাস্টার গঠনের বিষয়টি নিজ গুণেই অনন্য সাধারণ। এই নয়া ব্যবস্থা শিক্ষকদের প্রকৃত যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে।

এই শিক্ষানীতি স্বামীজীরও স্বপ্ন পূরণ করবে। স্বামীজী প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার মেলবন্ধন নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি স্বামীজীর সেই ভাবনারই সার্থক প্রতিফলন। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু বস্তুমুখী শিক্ষার বিস্তার নয়, বরং তাতে প্রাণেরও সঞ্চার ঘটাবে। নয়া ব্যবস্থায় কোনো পাঠক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত হওয়া বা সেই পাঠক্রম থেকে বেরিয়ে আসার সংস্থান থাকায় তা ঘুরিয়ে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রেও স্বামীজীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি মনে করতেন গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শিক্ষার

কাছে পৌঁছতে না পারে তাহলে শিক্ষাকে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রাক্‌প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে বিভাজন করার ফলে যথাযথভাবে শিক্ষাদান সম্ভবপর হবে। আর্টস, কমার্স ও সাইন্স শাখার বস্তাপচা দমবন্ধকর ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে এসে একজন শিক্ষার্থীকে তার পছন্দের বিষয়গুলো নিয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়াটাই এই শিক্ষানীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

শুধুমাত্র পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে জানা বা উপলব্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ছাত্র সমাজের সঠিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যেই এই নীতি প্রণীত হয়েছে। এই জানা বা উপলব্ধির বিষয়টি পাঠ্যসূচির বাইরেও শামিল রয়েছে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। পদ্ধতির পরিবর্তে আগ্রহ, ব্যবহারিকতা, আত্তীকরণ এবং সম্পাদনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ঠিক যেমনটি স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন, "Education is not the amount of information that we put into your brain and runs riot there, undigested, all your life. We must have life building, man making, character making assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library."

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে দেশের আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত সাড়ে বারো হাজার স্থানীয় প্রশাসন এবং ৬৭৫ টি জেলা থেকে গৃহীত দুই লক্ষ পরামর্শকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরাকাষ্ঠায় বিচার বিবেচনা করেই এই শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপির ছয় শতাংশ শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ নিঃসন্দেহে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করবে। বিদেশে মেধা চলে যাওয়ার যে জ্বলন্ত সমস্যায় এ রাজ্য তথা সারাদেশ ভুক্তভোগী, সেই সমস্যা নিরসনে নতুন এই নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এদেশে ক্যাম্পাস খোলার পথ প্রশস্ত করবে।

একবিংশ শতাব্দীতে অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে ছাত্র-যুব সমাজের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করা, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নতুন দিশার উন্মেষ ঘটানো, দেশকে সারা বিশ্বের সামনে পুনরায় জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা এবং পুনর্জাগরিত ভারতীয় সমাজের সার্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার এই ঐকান্তিক প্রয়াসকে সমস্ত রাজনৈতিক বৈরিতার ঊর্ধ্বে উঠে সাগ্রহে আপন করে নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষত আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে এই শিক্ষানীতির প্রভাব নিশ্চিত ভাবেই সুদুরপ্রসারী এবং ফলদায়ী হবে। কারণ বিগত কয়েক দশক ধরে ক্রমাগত সূক্ষ্ম মগজাঘাতের দ্বারা সংস্কৃতি সচেতনতার নামে বিকৃত ন্যারেটিভ ছাত্র-যুব সমাজের মননে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। সুচারুভাবে বিপ্লবের নামে সমাজকে তোয়াক্কা না করার বেপরোয়া মনোভাব এবং সেই বিপ্লবের আড়াল নিয়েই রাজনৈতিক মদতে অশ্লীলতা ও অসভ্যতার দিকটাকে সহজেই গ্রহণ করে নিয়েছে নতুন প্রজন্ম। এভাবেই তারা নিজেদের স্বাধীন মনে করছে। ঠিক এ কারণেই কয়েক দশক আগে এরাজ্যে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হয়ে যান, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি হন আর সেই একই সংস্কৃতি বহন করে আজ এরাজ্যে খোদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র সংস্কৃতি ধুলিস্যাৎ করে রোদ্দুর রায় সেলিব্রিটি হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ-ভাবনাকে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তি এবং শ্রেণী সংগ্রামের পথে বাধা বলে মূল্যায়িত করা এদেশের বামপন্থী গুরু মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আধুনিক শিষ্যরা ভারতীয় মূল্যবোধ এবং বৈশ্বিক মান অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা যে করবেই তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। অবাক লাগে যখন দেখি জাতীয় কংগ্রেসও বামেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নয়া শিক্ষা নীতির বিরোধিতা করে। অথচ এরাই ইউপিএ-২ জমানায় চৌত্রিশ বছরের পুরনো শিক্ষানীতির সংস্করণ করতে চেয়েও শুধুমাত্র সঠিক দিশা ও আদর্শের অভাবে করতে পারেননি। ইউপিএ–২ জমানার মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শশী থারুরের বক্তব্যেই তা পরিষ্কার ধরা পড়ে। তিনি বলেন, "মানবসম্পদ ও উন্নয়ন মন্ত্রকে আমার সময় থেকেই ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিকে সংশোধন করে একবিংশ শতাব্দীতে আনার পক্ষে তদ্বির করেছিলাম। আমি খুশি যে মোদী সরকার অবশেষে সেই সাহসটা দেখিয়েছে, যতই সেটা করতে ছয় বছর সময় লাগুক না কেন।" এর পরেও আমরা দেখছি জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব বিরোধিতার নামে অদ্ভুত আচরণের মাধ্যমে নিজেদের ক্রমাগত হাস্যাস্পদ করে তুলছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির এরূপ মূল্যবোধ রহিত দিশাহীন রাজনীতি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তার ভিত্তিতেই নড়বড়ে করে তুলছে।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং প্রাবন্ধিক)

শিবশক্তি সেবা ধাম

বারাণসী,
উত্তর প্রদেশ

হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভ মেলা ২০২১

শিবশক্তি সেবাধাম পরিচালিত প্রতি কুম্ভমেলার ন্যায় এবারও ২০২১শে হরিদ্বার, গঙ্গা-সংলগ্ন পোদ্দার ধর্মশালায় পাকাবাড়িতে থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। যারা যেতে চান 9451268600/ 7985210182 নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

ধন্যবাদান্তে
হৃষীকেশ মহারাজ
অধ্যক্ষ

শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের অপেক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ

শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন, শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের মানকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা প্রশাসনই পারে এই অমানিশার অবসান ঘটাতে।

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

বর্তমান সরকারের রাজত্বে শিক্ষার অনিলায়নের পরিবর্তে দুর্নীতিযুক্ত রাজনীতিকরণ ঘটেছে। শিক্ষার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের পরিবর্তে পশ্চাৎ অপসারণ অব্যাহত। ১৯৪৮ সালে শিক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ আজ সাক্ষরতায় ১৯তম রাজ্য হিসাবে বিবেচিত। মানযুক্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার পরিকাঠামো ও বাতাবরণ না থাকার কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ সমস্ত প্রথাগত শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় সহ অধীনস্থ সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বহু সংখ্যক আসন পূর্ণ হচ্ছে না। পরিকল্পনাহীন পরিকাঠামোহীন নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ফলে উচ্চশিক্ষার মানের ক্রম অবনমন ঘটেছে এবং ফলস্বরূপ পঠন-পাঠন ও গবেষণা তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। বারংবার ঘোষণা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার গবেষণার বৃত্তি দিতে ব্যর্থ অথচ ধর্মের নামে সংখ্যালঘু বৃত্তি প্রদানে অতি সক্রিয়। নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সহ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে গুণমান বিবেচিত না হয়ে দলতন্ত্র প্রাধান্য পাচ্ছে। টেট কেলেঙ্কারি, মহামান্য আদালতের নির্দেশে আপার প্রাইমারি নিয়োগের তালিকা বাতিল, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষকদের পেন্সিলে নম্বর দিতে বলে পেনে স্বাক্ষর, কলেজ সার্ভিস কমিশনের এক পরীক্ষককে দিয়ে বারবার পরীক্ষা নেবার প্রবণতা, শিক্ষক, প্রধানশিক্ষক, অধ্যাপক কিম্বা অধ্যক্ষদের মেধা তালিকায় প্রাপ্ত নম্বরের অনুপস্থিতি দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বার্তা

বহন করে।

স্কুলের পাঠক্রমে আধুনিকীকরণের অভাব, উর্দুশব্দের আধিক্য, ক্ষুদিরামকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে সরকারি বই প্রকাশের পর তা বাতিল করা, খারিজি মাদ্রাসা উগ্রপন্থার আঁতুড়ঘর জানা সত্ত্বেও এই বিষয়ে উদাসীন থাকা, বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলির ইচ্ছাকৃত মান উন্নয়নের চেষ্টা না করার ফলে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রাচীন এবং বিখ্যাত বাংলা মাধ্যম স্কুল বন্ধ হতে দেখেও নীরব থাকা রোজনামচায় পরিণত হয়েছে। সিঙ্গুর ইতিহাস হবার আগেই ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অমরত্ব দেবার বৃথা চেষ্টা চলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাজের উপর গবেষণা চলে, আমাদের মাথা নত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমা ক্ষুণ্ণ করতে শান্তিনিকেতনের অদূরে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার অসফল প্রয়াস চলে।

ইউ জি সির নির্দেশিকার বিলম্ব প্রয়াসের ফলে বাম আমলের দুবছরের ডিগ্রী অকেজো হয়েছে। আজও রাজ্যে সি বি সি (চয়েস বেস ক্রেডিট সিস্টেম)-এর নামে সেমিস্টার ব্যবস্থা চলে। অতিমারী পরিস্থিতিতে কলকাতা সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ওপেন বুক সিস্টেম চালু করে রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে। বাংলা শিক্ষকের পরিবর্তে অনাবশ্যক উর্দু শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে দাড়িভিটের মতো ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা ঘটে। বৌদ্ধিক চর্চার স্থল আজ মত্ত হস্তির তাণ্ডবে বিপর্যস্ত। রক্তঝরা দিনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে উপাচার্য গোপাল সেনের নৃশংস হত্যা কিম্বা বাম আমলে উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্যের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হেনস্তা উচ্চশিক্ষার অঙ্গনকে কালিমালিপ্ত করেছে। সর্ব সমক্ষে উপাচার্য আশুতোষ ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার অবসান কবে হবে আমরা জানি না। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির হস্তক্ষেপ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। উচ্চশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী নিজে, উপাচার্য নিয়োগে আচার্য সার্চ কমিটির ক্রমিক সংখ্যার পরিবর্তন পর্যন্ত করতে পারে না। প্রাথমিক, মাধ্যমিক কিম্বা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের মনোনীত সভাপতিদের বয়স বাড়িয়ে জীবিতকাল পর্যন্ত চাকুরি সুনিশ্চিত করা হয়। শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি বিমুক্ত করার পরিবর্তে অতিরাজনীতিকরণ করা হচ্ছে, বিষফলও ফলতে শুরু করেছে। প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িঘড়ি নিয়োগ শিক্ষার মান ফেরাতে পারে না, কালো টাকার পাহাড় গড়তে পারে। নতুন শিক্ষানীতি ২০২০-র আলোকে পাঠক্রমের আমূল সংস্কার করা হবে। শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের মানকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা প্রশাসনই পারে এই অমানিশার অবসান ঘটাতে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিয়োগ, পাঠ্যপুস্তক পর্ষদের পাশাপাশি প্রকাশক সংস্থাগুলিকে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে সাহায্য করা হবে। মুক্তচিন্তা ও মুক্তমনের শিক্ষানুরাগী মানুষের নিরন্তর অংশগ্রহণ ছাড়া যা অধরা থেকে যাবে। এই কঠিন ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শিক্ষা প্রশাসনের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। উদার, প্রয়োজনীয় ও সঠিক সিদ্ধান্তই পারে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করতে। বাংলার সুদিন তখনই আসবে যখন শিক্ষাঙ্গনে সুদিন আসবে। তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা-নালন্দার মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমা ফিরে আসুক। বিশ্বভারতীর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমায় আমাদের মাথা গর্বে উঁচু হয়ে উঠুক। শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের অপেক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ।

রাজ্যের সুদিন তখনই আসবে যখন শিক্ষাঙ্গনে সুদিন আসবে। তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা- নালন্দার মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমা ফিরে আসুক। বিশ্বভারতীর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমায় আমাদের মাথা গর্বে উঁচু হয়ে উঠুক।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ঃ

১। নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে পাঠক্রম রচনা, শ্রেণী বিন্যাস ঘটানো এবং শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

২। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত পদ দ্রুততার সঙ্গে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পূরণ করতে হবে।

৩। শিক্ষক নিয়োগে মেধাই একমাত্র বিবেচ্য হবে, রাজনৈতিক পরিচয় নয়।

৪। প্রত্যেক প্রাথমিক স্কুলে ছাদ ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। মিড-ডে মিলে অতিরিক্ত ক্যালরিযুক্ত খাদ্য দুর্নীতিমুক্তভাবে পরিবেশন করতে হবে। তদুপরি শিশুদের স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রধানশিক্ষক, অধ্যক্ষ ও উপাচার্য নিয়োগে দলতন্ত্রের অবসান ঘটাতে হবে।

৭। শিক্ষাপ্রশাসনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিকস্তরে নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। স্কুলের ও কলেজের পরিচালন সমিতিতে শিক্ষাজগতের মানুষদের অংশগ্রহণ স্কুল ও কলেজের পঠন-পাঠন এবং উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট কাউন্সিল কিম্বা সিনেট সিন্ডিকেট শিক্ষা অনুশীলনে সহায়ক ভূমিকা নেবে।

৮। পরীক্ষার নামে প্রহসন বন্ধ করা হবে। শিক্ষার মানের সঙ্গে কোনোরকম আপোশ করা হবে না।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং গবেষক)

শাসকের মদতে পশ্চিমবঙ্গে গোরুপাচারের বাড়বাড়ন্ত

তরুণ কুমার পণ্ডিত

রাজ্য সরকার ও বিএসএফের মদতে দীর্ঘদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো থেকে বাংলাদেশে গোরু পাচার হয়ে আসছিল। সীমান্তের বেশ কিছু জায়গায় কাঁটাতারের বেড়ার অনুপস্থিতি ও বিএসএফের টহলদারি না থাকায় খুব সহজেই গোরু পাচার সম্ভব হয়। মূলত মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর ও দুই চব্বিশপরগনা জেলার স্থল সীমান্ত ও জলপথে প্রতিদিন হাজার হাজার উত্তর ভারতের উঁচু উঁচু গোরু পাচারের ঘটনায় ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা ব্যথিত হয়েছে। গোরু পাচারের ফলে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে গোরুর পায়ের চাপে কৃষকদের ফসল নষ্ট হয়েছে, সহজলভ্য অর্থ অপরাধ জগতের সঙ্গে যুবসমাজকে যুক্ত করেছে এবং নেশায় আসক্ত করেছে। পাচারকারীরা সীমান্ত অঞ্চলে ইদানীং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাতেরবেলা কাঁটাতরের বেড়ায় বাঁশের মাচা বানিয়ে যেমন গোরু পাচার করছে তেমনি জলপথে কলার ভেলাতে গোরুগুলোকে বেঁধে ওপারে পৌঁছে দিচ্ছে। বিনিময়ে একটি গোরু পিছু বিএসএফের পকেটে আসে ১০ হাজার এবং রাজ্য পুলিশের মাধ্যমে শাসক রাজনৈতিক নেতারা পায় ১৫ হাজার টাকা। দেখা গেছে এই রাজ্যে ভোটের সময়েও এই গোরু পাচারের টাকায় রাজনৈতিক দলের কোষাগার ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে গোরু পাচার চক্রের মাস্টার মাইন্ড বলে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা এনামুল হককে সিবিআই গ্রেপ্তার করার পর তার কাছ থেকে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে উঠে এসেছে। কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হয়ে পড়েছে, জল অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। অর্থাৎ গোরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাওলার কোটি কোটি টাকা। হাওলার প্রায় এক হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে এই গোরুপাচারের আড়ালে বলে তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পেরেছেন। তাছাড়া গোরু পাচারের কোটি কোটি টাকা শাসকদলের নির্বাচনী তহবিলে গেছে বলে লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেছেন। তদন্তকারী আধিকারিকদের অনুমান, এই গোরু পাচারের মোটা টাকার একটি অংশ পৌঁছে যাচ্ছে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর হাতে। অথচ রাজ্য পুলিশের কাছে নাকি গোরু পাচারের তেমন কোনো খবর নেই। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে সোনার বাংলা হোটেলের মালিক এনামুল হক এখান থেকেই দীর্ঘদিন ধরে তার অবৈধ কারবার চালিয়ে যেতো আর পুলিশ তার কোনো খবর জানতো না, এটা অবিশ্বাস্য।

এদিকে গোরু পাচার চক্রের তদন্ত করতে গিয়ে সিবিআই বিএসএফের কমান্ডেন্ট সতীশ কুমারকে গ্রেপ্তার করেছে। তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পত্তির হদিশ মিলেছে বলে জানা গেছে।

এনামুল ছাড়াও আনারুল শেখ ও গোলাম মোস্তাফা দুই পাচারকারীর নামও প্রত্যক্ষভাবে পাচারের সঙ্গে জড়িত বলে তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পেরেছেন। তারা আটক হওয়া গোরুর দাম কম দেখিয়ে নিজেরা নিলাম করে নিয়ে পরে তা বাংলাদেশে পাচার করতো। সিবিআই গোরু পাচার কাণ্ডের তদন্তের জাল আরও ছড়াতে শুরু করেছে। গোয়েন্দাদের দাবি, শুধু বিএসএফ কমান্ডেন্ট সতীশ কুমার নয় , পাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিএসএফের ৭ জন ও ৫ জন শুল্ক দপ্তরের আধিকারিক। সেই সূত্র ধরে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বেশ কয়েকজন কয়লা ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে হানা দিয়েছিল আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। এই গোটা চক্রে যোগসাজশের তথ্য পেয়ে এবার আসানসোলের ৬ জন কয়লা ব্যবসায়ীকে নোটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই । অন্যদিকে পাচারের অভিযোগে ধৃত বিএসএফ কমান্ডেন্ট সতীশ কুমার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুরের কাছে সম্পত্তি ও তার হিসেব রয়েছে বলে সিবিআই-কে জানিয়েছেন। ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন নিজেকে বাঁচাতেই এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন বলে গোয়েন্দাদের দাবি। এছাড়াও সতীশ কুমারের স্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে এনামুল হকের পরিবারের কলকাতার সল্টলেকে বাড়ি ও ফ্ল্যাট, অমৃতসর, রায়পুর, দিল্লি এবং শিলিগুড়িতে সম্পত্তি ও কারবারের খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু ২০১৬ সালে স্বেচ্ছা অবসরের পর কীভাবে সতীশ কুমার ১৩ কোটি টাকার মালিক হলেন, তা জানতে চান তদন্তকারী অফিসাররা। আরও খবর কুখ্যাত কয়লা ব্যবসায়ী অনুপ মাঝি ওরফে লালার সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার এই তল্লাশি নিয়ে। রাজ্য পুলিশকে অন্ধকারে রেখে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কেন অভিযান চালানো হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তিনি তুলেছেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন অথচ রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কোনো তদন্ত শুরু করলে দোষীদের শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। আজ পর্যন্ত তাদের কোনো শাস্তিও হয়নি। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের কড়াকড়ি এবং সীমান্তে বিএসএফের তৎপরতায় ৬০ শতাংশ গোরু পাচার কমে গেছে। বিএসএফের গুলিতে সীমান্তে পাচারকারীদের মৃত্যুর ঘটনাও অনেক বেড়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের রাজ্যে গোরু পাচার এখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি এবং এই পাচার চক্রের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পরোক্ষ হাত থাকার জন্য ও পাচারের সঙ্গে যুক্ত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্যেই গোপাচার আজও রমরমিয়ে চলছে। যতদিন না কেন্দ্রীয় সরকার রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক গোসম্পদকে রক্ষা করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারবে ততদিন এদেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে আমরা কোনো সদুত্তর দিতে পারবো না। ❑

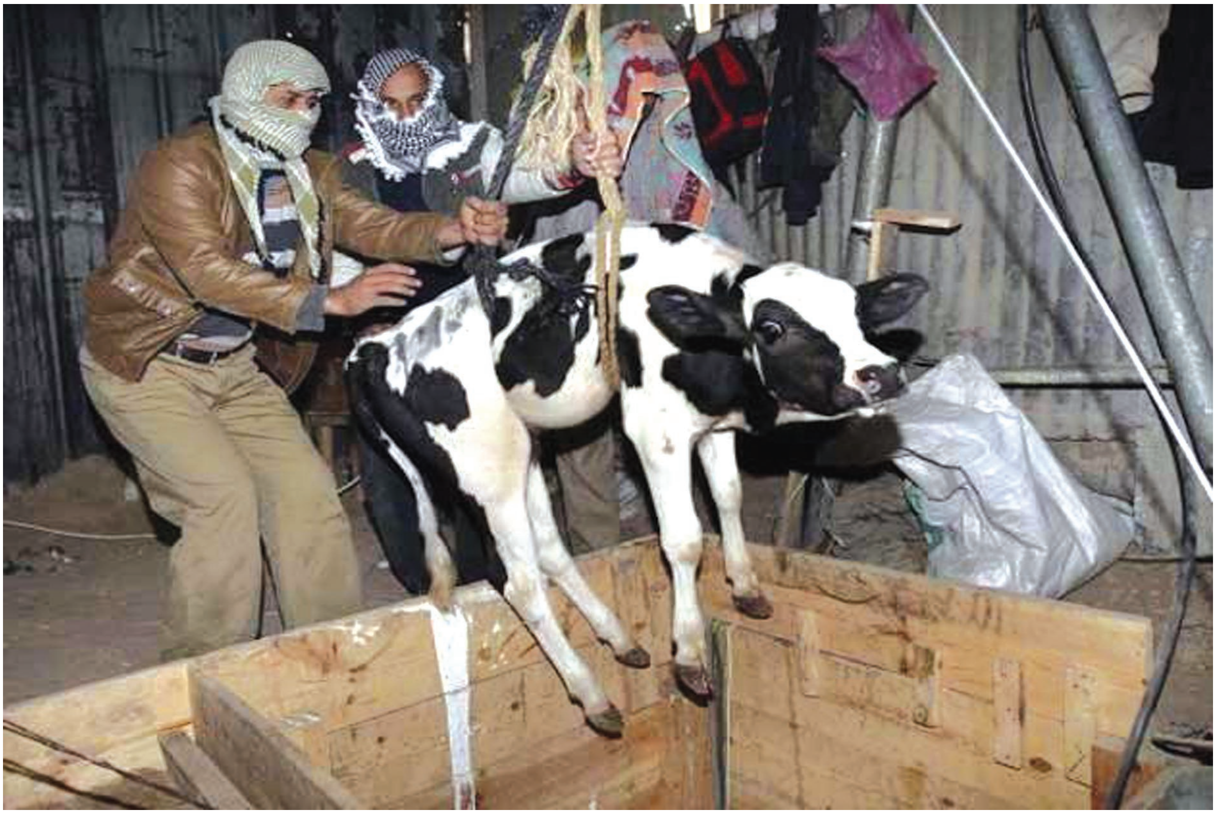

আলকায়দা জঙ্গি, গোরু ও কয়লা মাফিয়া চক্রের শেকড় নবান্ন পর্যন্ত বিস্তৃত নয় তো?

সাধন কুমার পাল

গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে মুর্শিদাবদের ডোমকল থেকে ছয় আলকায়দা জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। কেরল থেকে মুর্শিদাবাদেরই আরও তিন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর এনআইএ জনিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই ৯ জঙ্গিকে ট্রেনিং দিত পাকিস্তানে থাকা আলকায়দার মাথারা। ভারতে বড়ো নাশকতার ছক কষছিল তারা। এনআইএ-র তৎপরতায় দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও আলকায়দা জঙ্গি সন্দেহে ধৃতদের 'নিরপরাধ' বলে দাবি করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। আলকায়দা প্রসঙ্গে সিদ্দিকুল্লার বক্তব্য, মসজিদের ইমাম, স্থানীয় পঞ্চায়েত ও কাউন্সিলরের থেকে তিনি জেনেছেন, ধৃতদের অধিকাংশই 'ছা-পোষা'। তাঁর কথায় 'ডোমকলে যা ঘটেছে, তাতে দু'-একজন জাকির নায়েকের বই পড়েছে। বই পড়ে একটা মানসিকতা তৈরি হয়েছে। তা বলে তাদের উপর শাস্তি বর্তায় না।' খাগড়াগড় কাণ্ডেও মাদ্রাসা ব মসজিদ জড়িত ছিল না দাবি করে মন্ত্রী বলেন, 'মসজিদ, মাদ্রাসা, ইমামদের নাম করে মুসলমান সমাজের সঙ্গে সঙ্ঘাত তৈরি করতে চায় দিল্লি। কেন্দ্রীয় সংস্থার গোয়েন্দরা আরবি পড়তে জানেন না বলেই নিরপরাধ মানুষকে জঙ্গি বানাচ্ছেন।' গোরুপাচার নিয়ে সিদ্দিকুল্লার বক্তব্য, 'সীমান্তে যাঁরা আছেন, সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ — মূল অপরাধী তাঁরা। গোরুপাচার যারা করছে তারা অনেক নীচে। বিএসএফ তুমি সরকারের উর্দি পরেছ, তোমাদের হাতে রাইফেল। গদ্দারি করলে বিএসএফ করেছে।'

সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে মন্ত্রিত্বের

ফঃ ৬

BELLA VISTA
51 Limited Edition Flats
Flat Starts From 87.9 Lac Onwards
Birds Eye View
Roof Top Garden
Swimming Pool
Podium
WBHIRA Registration Number : HIRA/P/KOL/2019/000483
www.edengroup.in
Developed by: EDEN
JALAN
9830 116 116

মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে থেকে একদিকে জঙ্গি সন্দেহে ধৃতদের নিরপরাধ বলা, অন্যদিকে দেশের সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীবাহিনীকে গদ্দার বলে প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়ার পরেও বহাল তবিয়তে চেয়ারে থাকার অর্থ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সম্পূর্ণ ভাবে এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস বা রাজ্য সরকারের তরফে এটা বলা হয়নি যে সিদ্দিকুল্লার এই বক্তব্য তার ব্যক্তিগত, সরকারের নয়।

সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ, গোরুপাচার, জালনোটের কারবার, মাদ্রাসার জাল বিস্তার --- এগুলি সবই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে এনআইএ-র হাতে জলঙ্গি থেকে এক গুচ্ছ জঙ্গি গ্রেপ্তার হওয়ার পরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি অব্যাহত রাখছিল কেন্দ্রের একাধিক তদন্তকারী দল। এই সেপ্টেম্বরেই কেরলের বাসিন্দা বিএসএফ কমান্ডান্ট জিবু ডি ম্যাথিউয়ের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন অর্থের উৎস খুঁজতে গিয়েই পশ্চিমবঙ্গে গোরুপাচার চক্রের হদিশ পায় সিবিআই। তাতেই বিএসএফ, কাস্টমস-সহ বিভিন্ন দপ্তরের একাধিক সরকারি আধিকারিকের নাম উঠে আসে। গোয়েন্দারা জানতে পারেন মুর্শিদাবাদের ডাকসাইটে ব্যবসায়ী এনামুল হক ও তাঁর সিন্ডিকেট চক্রকে গোরুপাচার সহায়তা করতেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে বিশদে তদন্ত শুরু হলে অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে এফআইআর-এ সতীশ কুমারের নাম উঠে আসে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫-র ডিসেম্বর থেকে ২০২৭-র এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিএসএফের ৩৬ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডান্ট ছিলেন সতীশ কুমার। ওই ১৬ মাসে তাঁর বাহিনী মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে প্রায় ২০ হাজার গোরু বাজেয়াপ্ত করেছিল। কিন্তু সেই বাজেয়াপ্ত গোরু সরকারি খাতায় বাছুর হিসেবে দেখানো হচ্ছিল। গোরুর যা দাম, তার চেয়ে কম দামে সেগুলি স্থানীয় বাজারে নিলাম করা হতো। সেখান থেকে বাছুরের দামে গোরু কিনে নিত পাচারকারীরা। এই পাচারচক্রের মাথায়

এনামুল হক

অনুপ মাঝি (লালা)

সতীশ কুমার

ছিলেন এনামুল হক। তাঁর তত্ত্বাবধানে নিলামে কেনা ওই গোরু আবার বাংলাদেশে পাচার হয়ে যেত। গোরুকে বাছুর বানিয়ে দেওয়া বিএসএফ এবং কাস্টমস আধিকারিকদের সঙ্গে সংযোগ ছিল তাঁর। মোটা টাকা দিয়ে তাঁদের পুষিয়ে দিতেন তিনি। এমনটাই অভিযোগ।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর সতীশকুমারের সল্টলেকের বাড়িতে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সেই সময় রায়পুরে কর্মরত ছিলেন সতীশকুমার। সেখানেও তল্লাশি চালানো হয় একদফা। তাঁর গাজিয়াবাদের বাড়িতেও তল্লাশি চলে। তাতে আয়ের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ সঙ্গতিহীন সম্পত্তির হদিশ পান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। জানা যায়, অনেক আত্মীয়ের নামেও স্থাবর সম্পত্তি কিনে রেখেছেন তিনি। ঘুষের টাকা বিভিন্ন সংস্থায় বিনিয়োগ করেছেন। যদিও সেই সময় এনামুলের নাগাল পাওয়া যায়নি। সিবিআই সূত্রে প্রাথমিক ভাবে জনা গিয়েছে, গোরুপাচার করে যে বিপুল পরিমাণ টাকা এনামুল হক আয় করে তা বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য বিনিয়োগ করত। গোরুপাচার করতে গিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একাধিক কর্তার সঙ্গে এনামুল হকের গোপন আঁতাত তৈরি হয়। সেইসব কর্তাদেরও খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সিবিআই।

রিপোর্ট বলছে, বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ গোরুপাচারের অপরাধে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে সিবিআই গ্রেপ্তার করে এনামুল হক-কে। সপ্তাহ তিনেক সিবিআইয়ের হেপাজতে থাকার পর জামিনে মুক্ত হয় ওই পাচারকারী। একইদিনে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গোরুপাচার চক্রের পাণ্ডাদের খোঁজে তল্লাশি চালান সিবিআই-এর গোয়েন্দারা। এর মধ্যে বিধাননগরে এক বিএসএফ কর্তার বাড়ি সিল করে দিয়েছে সিবিআই। উদ্ধার হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি। তদন্তকারীদের অনুমান, বাংলাদেশে গোরুপাচারের টাকার একটা বড়ো অংশ যায় জঙ্গিদের হাতে।

৬ নভেম্বর ভোরে দিল্লি থেকে এনামুল হক-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনা হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। অমিত শা'র রাজ্য সফর চলাকালীন কলকাতা ও আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় একযোগে চালায় দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা— সিবিআই ও আয়কর দপ্তর। গোরুপাচরে অভিযুক্ত প্রাক্তন বিএসএফ কর্তা সতীশকুমারের সল্টলেকের বাড়িতেও চলে অভিযান। এছাড়া সিআরপিএফ-কে সঙ্গে নিয়ে

আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায় কয়লা ব্যবসায়ীদের বাড়ি ও অফিসে হানা দেন আয়কর দপ্তরের কর্তারা। সুত্রের খবর, গেরুপাচারকারী এনামুলের দলের সঙ্গে কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া 'লালা' ওরফে অনুপ মাজির যোগাযোগ পেয়েছে সিবিআই। এ নিয়ে ইডি-র তদন্ত চললেও সমান্তরাল তদন্ত চালানোর কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। এর জন্য সারদা কাণ্ডের তদন্তে যুক্ত আধিকারিকদের দিল্লিতে তলব করেছে সিবিআই। জানা গিয়েছে, কয়লাকাণ্ডে আয়কর দপ্তরের কাছ থেকে তদন্তের ভার নিতে চায় সিবিআই।

সম্প্রতি, আয়কর দপ্তর কয়লাকাণ্ডে যুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালা ও বেশ কিছু ব্যবসায়ীর কলকাতা, আসানসেলের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি পেয়েছে। নথির ভিত্তিতে তারা জেনেছে, রাজ্যের ভিতর গোরুপাচারে যুক্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কয়লা ব্যবসায়ীদের যোগ রয়েছে। উভয় পক্ষই রাজ্যের বেশ কিছু প্রভাবশালীদের সঙ্গে সখ্য রেখে নানা বেআইনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে সম্প্রতি নোটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই। এবার কয়লাকাণ্ডের তদন্ত হাতে নিতে চলেছে সিবিআই। এনামুলকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। তাঁর বয়ানের সূত্র ধরে সেই মামলায় গত ১৭ নভেম্বর জেরার জন্য কলকাতার নিজাম প্যালেসে ডাকা হয় সতীশকুমারকে। সেখানেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে।

রাজ্য পুলিশকে না জানিয়ে আচমকা কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযান কেন? এই প্রশ্ন তুলে সিদ্দিকুল্লার পর এবার মাঠে নামেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের মুখে রাজনীতির রং মাখিয়ে জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরির প্রয়াস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণ নিয়ে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন সাধারণ মানুষের মনেও সেই প্রশ্নগুলিই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর প্রশ্ন, 'সীমান্তে না হয় বিএসএফ টাকা লুঠ করেছে। কিন্তু পুলিশ ও

শাসকদলের মদত ছাড়া গোরুপাচার কী করে হতে পারে? গাড়ি করে জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে গোরাপাচার হয়। মানিব্যাগে করে তো আর গোরুপাচার হয়নি?' অধীরবাবুর দাবি, গোরুপাচারের টাকায় তৃণমূল নেতারা নির্বাচনী তহবিল গঠন করেছেন। এই টাকা গিয়েছে পুলিশের পকেটেও।' এদিন সরাসরি তৃণমূলকে আক্রমণ করে অধীরবাবু বলেন, গোরুপাচারে তৃণমূল নেতাদের কত করে মাসোহারা দিতে হতো ত পুলিশ তো জানেই, সাধারণ মানুষও ভালো করে জানে। মুর্শিদাবাদে তো তা ওপেন টু অল। কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টার (লালবাজার) থেকে দিদির দলের জন্য টাকার পাহাড় তৈরি করতে গোরুপাচারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।' এই লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত অধীর চৌধুরীর বক্তব্য রাজ্যসরকার, রাজ্য পুলিশ কিংবা তৃণমূল কংগ্রেস খণ্ডন করেনি।

এছাড়া মমমতার এই আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এনামুল গেপ্তারের প্রসঙ্গ টেনে সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহ নিজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, 'ওই ব্যক্তির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী সম্পর্ক? উনি কেন বাঁচাতে চাইছেন?' এনামুলের গ্রেপ্তারি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসুও। তাঁর শ্লেষাত্মকভঙ্গীতে বলেন, 'কোন শিল্পে অরাজকতা নেই বলুন তো? সকাল-বিকেল এখন সিবিআই তল্লাশি করে হাতেনাতে ধরছে এখানকার গোরুপাচারকারী ও কয়লা পাচারকারীদের। আর তাদের হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কান্নাকাটি করেন, ত্রাহি ত্রাহি রব করেন, কেন?'

ইসলামিক সন্ত্রাস, গোরুপাচার, জালনোটের কারবার ও মাদ্রাসা নেটওয়ার্ক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যে শক্তিশালী পরিকাঠামো তৈরি করে ফেলেছে এটা এতদিন শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু প্রাক্তন বিএসএফ কর্তা সতীশ কুমারের গ্রেপ্তার, আলকায়দা জঙ্গি ও গোরুপাচারের মূল মাথা এনামুলের গ্রেপ্তারি ও কেন্দ্রীয় সংস্থার তল্লাশি নিয়ে মমতা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এবং শেষে খোদ মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে প্রশ্ন তুলে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাতে এটা বোধহয় এটা বলা যায় যে যে দেশ বিরোধী চক্রান্তের শেকড় রাজ্য সরকারকেও গ্রাস করেছে। এই নেটওয়ার্কের জাল ছিঁড়ে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে শুধু সিদ্দিকুল্লা নয় জেরা করা উচিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। □

তৃণমূলের গুন্ডার ভয়ে টেবিলের নীচে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচান আলিপুর থানা পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গে কেন পরিবর্তন চাই

বিনয়ভূষণ দাশ

২০১১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বহু ইপ্সিত রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছিল। তবুও আজ এরাজ্যের মানুষ আবার একটা পরিবর্তন চাইছে। রাজ্যের হাটে-মাঠে-ঘাটে, দোকানে-বাজারে-চায়ের দোকানে একটু কান পাতলেই বোঝা যায়, মানুষ দ্রুত এরাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তন চাইছে। তাঁদের মনে হচ্ছে, দুহাজার এগারোর পরিবর্তনটা এরাজ্যের মানুষের ইপ্সিত লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকার্জন, জীবনযাপন প্রণালী কোনোকিছুতেই কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন তো হয়ইনি, পরন্তু বাঙ্গালির জীবনের সর্বক্ষেত্রে দগদগে চিহ্ন প্রকাশমান। প্রাক-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, চাকুরিবাকুরির ক্ষেত্রে যে উচ্চশিখরে ছিল তার ক্রমাবনতি ঘটেছে বিধানচন্দ্র রায়ের পরে এরাজ্যে। সেই অবনতি চরমে পৌঁছেছে তথাকথিত বাম এবং তৃণমুলিদের রাজত্বে।

একসময় পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণী থেকে শুরু করে কলকাতা বিড়লাপুর পর্যন্ত, অন্য দিকে ত্রিবেণী থেকে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত হুগলী (গঙ্গা) নদীর উভয়তীরে একশো কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রায় পনেরো কিলোমিটার চওড়া এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এক সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল। জেলা হিসেবে অখণ্ড চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া জেলার বেশকিছু অঞ্চল নিয়ে গঠিত এই অঞ্চল কলকাতা ও হাওড়াকে কেন্দ্র করে গঠিত। পাটশিল্প, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বস্ত্রশিল্প, কাগজ শিল্প, চর্মশিল্প ও অন্যান্য শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল এই শিল্পাঞ্চল। স্মর্তব্য যে, এই শিল্পাঞ্চল ভারতবর্ষে সবচেয়ে প্রাচীন এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম। শুধু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ নয়; বিহার, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও এই শিল্পসমূহে কাজ করার জন্য জনসমাগম হতো। কিন্তু প্রথমে বামপন্থীদের ধারাবাহিক শিল্পবিরোধী আন্দোলন এবং পরে তাঁদের দীর্ঘ রাজত্বে এই 'হুগলী শিল্পাঞ্চল' ধ্বংস হয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের মণীন্দ্র মিল এবং বি টি মিল নামের দুটি কাপড়ের মিল, বেলডাঙ্গার চিনি কল সহ সারা রাজ্যের অসংখ্য শিল্প। স্মর্তব্য যে, মুর্শিদাবাদের রূপকার বলে

EDEN RICHMOND ENCLAVE
READY TO MOVE
EDEN
24.27 L Onwards
Near Narendrapur
(Atlas More, Kodalia)
2/3 BHK | 809-979 Sq. f.t
Landscape Garden | AC Community Hall | Swimming Pool | Gymnasium |
Home Theater Room | Children's Play Room | Games Room
9073 666 771
www.edengroup.in
HIRA/P/SOU/2018/000240 | https://hira.wb.gov.in

কথিত অধীর চৌধুরীর সংসদে দাপাদাপি সত্ত্বেও কিন্তু মুর্শিদাবাদের ওই শিল্পগুলি পুনর্জীবিত হয়নি! গণশক্তির মতো সিপিএমের মুখপত্রে লেখা হয়, ‘‘ধর্মঘটে স্তব্ধ হবে হুগলী শিল্পাঞ্চল, প্রস্তুতি ঘরে ঘরে।’’ এই শিল্পাঞ্চল ধ্বংসের কারণ তাই সহজেই অনুমেয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে তিনি দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলেছিলেন। বিশাল বিশাল এলাকা নিয়ে সেগুলি আজ এক একটি শিল্পশ্মশানে পরিণত। বিগত দশ বছরাধিক কাল তৃণমূলের শিল্পবিরোধী আন্দোলন শিল্পের কফিনে শেষ পেরেকটিও পুঁতে দিয়েছে। একসময়ের শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ আজ শিল্পশ্মশানে পরিণত। ফলে এই রাজ্যে মানুষের রুজিরোজগারে টান পড়েছে; কাজের খোঁজে তাঁদের ‘পরিযায়ী’ শ্রমিক হয়ে রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে যাযাবরের জীবনযাপনে বাধ্য করেছে। অবশ্য দেখা গেছে, যাঁদের অপশাসনের কল্যাণে এই পরিযায়ী শ্রমিকের সৃষ্টি, গত এক বছরকাল ‘করোনা আবহে’ সেই সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ শ্রাবণের অবিশ্রাম ধারাকেও হার মানিয়েছে। আর গত কয়েক বছর যাবৎ তো আবার নতুন শিল্প– চপমুড়ি শিল্পের কথা শোনা যাচ্ছে!

এরপরে আসে শিক্ষা। একসময় এরাজ্যের মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরোনা ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু এরাজ্য নয়, গোটা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান নিয়াম ছিল। প্রেসিডেন্সি-সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আইএএস, আইপিএস ইত্যাদি প্রশাসনিক চাকুরির ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতে এগিয়ে ছিল। এখানকার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর আজ এরাজ্যের রুগিদের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। বাঙ্গালি আইএএস, আইপিএস আজ দুর্লভ। প্রেসিডেন্সি, যাদবপুরের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এখন আর কোনো পদস্থ আধিকারিক বেরোয় না, বেরোয় মাওবাদী।

কংগ্রেসি রাজত্বের শেষদিকে অবক্ষয় শুরু হয়, বামেদের রাজত্বে এসে এরাজ্যের শিক্ষাজগৎ অবক্ষয়ের চরমে পৌঁছায়। শিক্ষাক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দলের দখলদারিও চরমে পৌঁছায়। শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি

বাম আমল থেকে বন্ধ ডানলপ কারখানা। হাজার হাজার পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ব্যবস্থার রমরমা শুরু হয় বামেদের রাজত্বকালে। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় সর্বত্র সিন্ডিকেটরাজ চালু হয়; শিক্ষার 'অনিনালন' ঘটে। উৎকর্ষের স্থান গ্রহণ করে দলতন্ত্র! তদের প্রতি নিষ্ঠাবান কর্মীদেরই উপাচার্য, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষক ইত্যাদি পদে নিযুক্ত করা শুরু হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্যকে দিয়ে এর শুরু। Red Hammer Over Calcutta University (1984–1987) নামক পুস্তকে তিনি এ বিষয়ে সবিস্তারে লিখেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সিপিএমের নগ্ন আক্রমণের কাহিনির সাক্ষী তিনি স্বয়ং। কারো আবার ডক্টরেট ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও কেবল দলীয় আনুগত্যের কারণে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। এমনকি খুনির সর্দারকে এক প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারও নিযুক্ত করা হয়েছিল। এমন হাজারো উদাহরণ দেওয়া যায় মার্ক্সবাদী রাজত্বকালের। আবার তৃণমূলের রাজত্বে ভোল পালটিয়ে এই মহোদয়েরাই নৈবেদ্যের কলা হয়ে বিরাজ করছেন। এরাজ্যে স্তাবক বুদ্ধিজীবী অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থে সোচ্চার হওয়া বুদ্ধিজীবী ডুমুরের ফুলের মতোই দুঃষ্প্রাপ্য। সুনীতি চাটুজ্যে, সুকুমার সেন, যদুনাথ সরকার, রমেশ মজুমদার, রামানন্দ চাটুজ্যের বাঙ্গলায় এখন ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী সমাকীর্ণ!

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও তথৈবচ অবস্থা। একসময়ে, আমাদের বাল্যবয়সে দেখেছি, শহর ও গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলির দুপাশে ডি ডি টি পাউডার স্প্রে করা হতো, হাসপাতালে কিছুটাও দাতব্য চিকিৎসা পাওয়া যেত; কিছু সাধারণ ওষুধ বিনামূল্যে পাওয়া যেত। এখন হাসপাতালে গেলে টাকা দিয়ে টিকিটি কাটতে হয়, রুগিকে ওযুধ বাইরে থেকে কিনে দিতে হয়। দিকে দিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে নার্সিং হোম নামের কসাইখানা! সেখানে গরীব মানুষের চিকিৎসা সুদূর পরাহত! আর এসবই শুরু হয়েছে তথাকথিত গরিবের বন্ধু সিপিএমের রাজত্বকালে; ওই ব্যবস্থাই তৃণমূলের রাজত্বে পল্লবিত হয়ে 'কাটমানি' রাজত্বে পরিণত হয়েছে। আর এই অবক্ষয় শুধু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই; বাঙ্গালির ভাষা ও সংস্কৃতিতেও এই অবক্ষয়ের অপঘাত হয়েছে। একদিকে ভারতের সংস্কৃতির ভাষা সংস্কৃতকে চরম অবহেলার সম্মুখীন হতে হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাভাষার উপর আরবি ও উর্দুর আগ্রাসন শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে। কলকাতার কিছু অঞ্চল, বিশেষ করে রাজাবাজার, কলুটোলা, জোড়াসাঁকো ইত্যাদি অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর অংশ বলে চেনা মুশকিল; গ্রামীণ অঞ্চলের কেউ কলকাতায় এলে তাঁর পক্ষে ওই অঞ্চলের অলিগলি খুঁজে বার করা মুশকিল। বাংলা শব্দাবলীতে দ্রুত স্থান করে নিচ্ছে আরবি, উর্দু শব্দাবলী। স্থান করে নিচ্ছে আরবীয় সংস্কৃতি। এরাজ্যে বাংলাভাষার শিক্ষক চাইতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হয় দাঁড়িভিটের রাজেশ ও তাপসকে। আর এসবই হয় রাজ্য শাসকদলের নেতাদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায়। রাজ্যের বহু অঞ্চলে মধ্যযুগীয় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও বর্বরতা ক্রমবর্ধমান। খাগড়াগড়, ডোমকল, ধুলাগড়, ক্যানিং-নলিয়াখালি, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, বসিরহাট তালিকা দীর্ঘ।

রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে এই রাজ্যে এখন একদিকে সোহারাওয়ারদির আদর্শকে সামনে রেখে এক বৃহত্তর মুসলিম বাঙ্গলা গঠনের প্রয়াস চলছে; অন্যদিকে বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির উপর চলছে উর্দুভাষীদের আগ্রাসন। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন অংশ— মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অংশে সশস্ত্র জেহাদি গুন্ডাদের তাণ্ডব চলেছে। আবার মধ্যবঙ্গে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে সামনে রেখে এক নবাবি বাঙ্গলার খোয়াব দেখছে কেউ কেউ। রাজ্যে অহিন্দু জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। অথচ বাঙ্গালির জীবনবোধ আধুনিককালে শুরু হয়েছে রামমোহন রায়ের উপনিষদের ব্রহ্মকে নতুনভাবে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। ক্রমন্বয়ে এই ধারায় মিশেছে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, বক্তৃতা, চন্দ্রনাথ বসুর 'হিন্দুত্ব' বোধ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সাধনা ও তাঁদের বাণী ও রচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও রচনা এবং স্বদেশপ্রেম। বাঙ্গলার যে সুপ্রাচীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল সেখানেও থাবা বসিয়েছে বিদেশের পদলেহনকারী এই মার্ক্সবাদী দল; তাঁদের অনুগত শিষ্য, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও সেই একই ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছেন। রাম ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে কৃত্তিবাস ওঝা ও শ্রীচৈতন্য বাঙ্গলার যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তৈরি করেছিলেন তা এঁরা পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসাবাণিজ্য পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করেছে বামেরা। তৎপরে তৃণমূলের মস্তিষ্কবিহীন সরকার। রাজ্যের এই সরকার বাঙ্গালির খাদ্যসংস্কৃতিতেও পরিবর্তন করেছে; বাঙ্গালির চিরাচরিত খাদ্য 'মাছ-ভাত' সংস্কৃতি বদলে 'ডিম-ভাত' খাওয়াতে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গকে এই সার্বিক অবক্ষয় থেকে বের করে আনতে হবে। ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতির অবক্ষয় রোধ করে তাকে গতিশীল করতে হবে, শিক্ষাক্ষেত্রে আনতে হবে ইতিবাচক এক নতুনদিক, রুদ্ধ হওয়া অর্থনীতিকে গতিশীল করতে হবে; অনুদানের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে শিল্পস্থাপন ও ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলতে হবে। আর নতুন গড়ে ওঠা বাম-কংগ্রেস-আব্বাস সিদ্দিকি জোট বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের দ্বারা এই সোনার বাঙ্গলা গঠন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়; বরং এই জোট ও মমতার সরকার নতুনকরে দেশ ও বাঙ্গলাভাগের স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। রাজ্যের নাগরিকদের তাই নতুন বিকল্পের সন্ধান করতেই হবে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক উপর ভিত্তি করা, বাঙ্গলার সুসন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্থাপন করা এবং অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ ও অধ্যাপক হরিপদ ভারতী লালিত ভারতীয় জনসঙ্ঘের উত্তরসুরী ভারতীয় জনতা পার্টিই একমাত্র হতে পারে সেই তৃতীয় বিকল্প। ■

দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিজেপির লক্ষ্য সোনার বাঙ্গলা

বিজেপি চায় পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থে সরকার পরিচালিত হোক— এটাই বিজেপির লক্ষ্য।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

লক্ষ্য সোনার বাঙ্গলা। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি এই কার্যক্রম শুরু করেছে। এই কার্যক্রমের মূললক্ষ্যই হল, সমাজের বিশিষ্টদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিজেপির ভাবমুর্তি তুলে ধরা। প্রশ্ন হলো, কী সেই ভাবনা? আর লক্ষ্য সোনার বাঙ্গলাই বা কী? ২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বয়স হবে ৭৫ বছর। তার আরও দু-দশক পরে, পশ্চিমবঙ্গ একশো বছরে পা রাখবে। এই পঁচাত্তর বা একশো বছরে পশ্চিমবঙ্গের কোন চেহারা দেখতে চাই আমরা? একটি হতশ্রী, মলিন, ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার এবং সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া একটি পশ্চিমবঙ্গ কি আমরা দেখতে চাই আদৌ? নাকি, এক উজ্জ্বল, উন্নত, সর্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য এক পশ্চিমবঙ্গকেই দেখতে চাই। সকলেই সহমত হবেন যে, এই দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ যদি দেখতেই হয়, তাহলে পুনর্গঠনের কাজ আমাদের এখন থেকেই শুরু করতে হবে। এই পুনর্গঠনের কাজটি বিজেপি কীভাবে শুরু করতে চায়—লক্ষ্য সোনার বাঙ্গলা কার্যক্রমটির মাধ্যমে সমাজের বিশিষ্টজনদের কাছে এই ভাবনাটি তুলে ধরাই উদ্দেশ্য।

একথা স্বীকার করতেই হবে--- পশ্চিমবঙ্গের একটি উজ্জ্বল অতীত ছিল। শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি—সর্বক্ষেত্রেই এই দেশে পশ্চিমবঙ্গ ছিল একটি অগ্রগণ্য রাজ্য। সেই উচ্চতা থেকে পশ্চিমবঙ্গের অধঃপতনের শুরু হয়—ছয়ের দশকের শেষ থেকে। দেশভাগের পর যে দুটি প্রদেশে শরণার্থীদের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল তারা হচ্ছে অসম ও পশ্চিমবঙ্গ। সদ্য জন্ম নেওয়া একটি রাজ্যে, স্বাধীনতার পরপরই এই ভয়াবহ সংকট সামলে এই রাজ্যটিতে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখাই ছিল একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছিলেন দুই বাঙ্গালি ব্যক্তিত্ব। একজন স্বাধীন ভারত সরকারের প্রথম শিল্পমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়জন রাজ্যের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ, আসানসোল, কুলটিতে

ফঃ ৭

একটি শিল্পোন্নত অঞ্চল গড়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গে। সেই সময় ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীয়। সেই অবস্থান থেকে আমাদের রাজ্যের অধঃপতন শুরু হয় ৬৭-৬৯ সালে। যখন প্রথম এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। সেই সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গ এক হঠকারী, অবিমৃশ্যকারী, অদূরদর্শী রাজনীতি প্রত্যক্ষ করতে শুরু করে। এক নেগেটিভ পলিটিক্স শুরু হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গে। পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও সেই রাজনীতি থেকে পশ্চিমবঙ্গ এখনো মুক্ত হতে পারেনি। সেই ৬৭-৬৯ সাল থেকে বামপন্থীদের ধ্বংসাত্মক রাজনীতির কারণে বিনিয়োগকারীরা এই রাজ্য থেকে সেই যে পাততাড়ি গোটাতে শুরু করলেন---এই এতবছরেও সেই বিনিয়োগকারীরা আর মুখ ফেরাননি পশ্চিমবঙ্গের দিকে। এই পাঁচ দশকে পশ্চিমবঙ্গবাসী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত অরাজকতা প্রত্যক্ষ করেছে। বাম শাসনের সাড়ে তিন দশকে দেখেছে সংকীর্ণ পার্টিবাজি, অদূরদর্শী এবং হঠকারী রাজনীতি, গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতিকে অবমাননা, ভ্রষ্টাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা। তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দশ বছরের এই সরকার। গত দশবছরে পশ্চিমবঙ্গকে অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন এই তৃণমল কংগ্রেসের সরকার। সর্বস্তরে চূড়ান্ত দুর্নীতি, নগ্ন তোষণের রাজনীতি, সন্ত্রাস, মিথ্যাচার এবং হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু এই রাজ্যের মানুষকে দেয়নি এই সরকার। এভাবেই গত পাঁচ দশকে সোনার বাঙ্গলা ক্রমশ হতশ্রী বাঙ্গলায় পরিণত হয়েছে।

লক্ষ্য সোনার বাঙ্গলা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিজেপি এই অবস্থা থেকে পশ্চিমবঙ্গকে উত্তরণের কথা বলছে। এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রথমেই গত পাঁচ দশকের এই নেগেটিভ রাজনীতির মানসিকতা পরিবর্তন দরকার। নেগেটিভ রাজনীতির বদলে এবার পজিটিভ রাজনীতি করার সময় এসেছে—এই বার্তাটিই বিজেপি পৌঁছে দিতে চাইছে মানুষের কাছে। মানসিকতার এই পরিবর্তন না হলে, কোনোভাবেই যে সোনার বাঙ্গলা গঠন সম্ভব নয়—সে কথাই বিজেপি বলছে। বিজেপির বক্তব্য খুব পরিষ্কার। বিজেপি বলছে, তারা শুধু সরকারের সমালোচনার মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতে চায় না। সরকারের ভুলভ্রান্তি, সমালোচনা নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু সেটাই একমাত্র এবং শেষ কথা নয়। বিজেপি মনে করছে তারা ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরে উন্নয়নে কী পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করবে---সেটিও সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের সেটি জানারও অধিকার রয়েছে। সেই পজিটিভ ভাবনাটিকেই বিজেপি তুলে ধরতে চাইছে। বিজেপি মনে করছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে শুধুমাত্র বিজেপি বনাম তৃণমূল---নিছক এমন একটি রাজনৈতিক লড়াই হিসাবে দেখলে চলবে না। এটাকে মানসিকতার পরিবর্তনের লড়াই হিসেবে দেখতে হবে।

একথা ঠিক, সরকারে এলে, সরকারের আগামী কর্মসূচী কী হবে তার একটি আগাম পরিকল্পনা থাকা উচিত। পরিকল্পনাহীনভাবে সরকারে এসে গেলে সেই সরকার গঠনমূলক কোনো কাজের পরিবর্তে চমকের রাজনীতির প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে। যেমনটা হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন এই সরকারের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটিই রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। তা হলো সিপিএম বিরোধিতা। কিন্তু ক্ষমতায় এলে কী করবেন সে সম্পর্কে কোনো সঠিক পরিকল্পনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল না। কিন্তু বিজেপি এই সামগ্রিক পরিকল্পনার কাজটি অগ্রিম করে রাখতে চাইছে, যাতে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পরিকল্পনামাফিক সেই কাজ দ্রুত শুরু করে দেওয়া যায়। বিজেপির পাঁচজন নেতা এই পরিকল্পনা রচনা করছেন---বিষয়টি এমনও নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা এই পরিকল্পনা রচনা করছেন। বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামত নিয়েই এই পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে।

বিজেপি কোনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মানুষকে দেয় না। বিজেপি যে পরিকল্পনা রচনা করেছে, তার ভিতর কতকগুলি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আইনশৃঙ্খলা। রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এবং তার জন্য ভারী শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভারী শিল্পে বিনিয়োগের জন্য শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানানোর জন্য নির্দিষ্ট শিল্পনীতি ও জমিনীতি প্রণয়ন করছে বিজেপি। মমতা সরকারের দশবছরে এই জমি নীতির কোনো রূপরেখাই ছিল না। পরিকাঠামোগত কী কী সুবিধা শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের দেওয়া যাবে---সে নিয়েই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার এবং সম্ভাবনা বৃদ্ধির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। পর্যটন শিল্পের প্রসার বৃদ্ধির ভাবনাও চলছে। কৃষিক্ষেত্রের জন্য আরও বেশি হিমঘর এবং কৃষি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সেচের জল পৌছানোর ব্যবস্থার পরিকল্পনা রয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জেলা ও গ্রামীণ হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো উন্নতি করা, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের ভিতর নিয়ে আসা---এই পরিকল্পনাগুলিও রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে নৈরাজ্য বন্ধ করা, পুলিশকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেওয়া, সর্বস্তরে দুর্নীতি রোধে কঠোর মনোভাব—সরকারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই কাজগুলি অবিলম্বে শুরু করার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিজেপি চায় পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থে সরকার পরিচালিত হোক—এটাই বিজেপির লক্ষ্য। আর তা যদি হয়, তাহলেই একমাত্র সোনার বাঙ্গলা গড়ে তোলা সম্ভব।

(লেখক সাংবাদিক এবং গবেষক)

করোনা অতিমারীর মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকা বিশ্বসেরা

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

করোনা ভাইরাসের ঘোষিত সংক্রমণ শুরু হয় চীনে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে। তারপর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে অতিমারী ঘোষণা করার আগেই আমাদের দেশে এই সংক্রমণের প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রচেষ্টা শুরু হয়। সরকারি স্তরে কেন্দ্র প্রথমে আন্তর্জাতিক বিমানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। দেশে, বিশেষত দিল্লি, মহারাষ্ট্র ও কেরলে প্রথম দিকে হু হু করে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় ২০২০ সালের ২২ মার্চ থেকে সারা দেশে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়। এরপর কেন্দ্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রী নিজে ঘোষণা করেছেন এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর ভিত্তি করে এই লড়াই চালিয়েছেন। দেশ জুড়ে বিভিন্ন মিডিয়া লকডাউনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে। এটা অন্তত সবাই মানবেন যে লকডাউন দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু এই লকডাউন যে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ঘোষিত ও পালিত হয়েছে, তার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কৃতিত্ব যথেষ্ট। আমাদের দেশ জনসংখ্যার বিচারে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। প্রথম যদিও চীন, তবু ওই দেশের মেডিক্যাল বুলেটিন মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই সর্বাধিক জনঘনত্বের দেশ ভারতে কিন্তু করোনায় মৃতের সংখ্যা আমেরিকা ও ব্রাজিলের অনেক নীচে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সময় সময় দেশবাসীর কাছে তাদের কষ্টের ও ধৈর্যের জন্য শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করে যে আমাদের মনোবল বাড়িয়েছেন তাই নয়, একই সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মেনে test-isolation-treatment নীতির ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন। তিনি বারবার প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে সব আক্রান্ত রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কিট ও বিভিন্ন আর্থিক প্যাকেজ পাঠিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার করোনা মোকাবিলায় ভাইরোলজিস্ট ও বায়োটেকনোলজিস্টদের পরামর্শই শুধু নেননি, তা কার্যকর করতে বিভিন্ন রাজ্যকে প্রয়োজনীয় সহায়তাও দিয়েছেন। আক্রান্ত রাজ্যগুলিতে কঠোর লকডাউনের ফলে করোনা সংক্রমণ অনেকটাই কমিয়ে রাখা গেছে, তা পরিসংখ্যানেই বোঝা যাচ্ছে। এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে আমেরিকা, ব্রিটেন, ইটালি, ফ্রান্স, ব্রাজিল ইত্যাদি উন্নত দেশগুলির ব্যর্থ হওয়ায় তাদের মৃতের সংখ্যা ভারতের জনঘনত্ব অনুযায়ী মৃত্যুর নিরিখে আমাদের দেশের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এই লকডাউন পর্বে আমাদের দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের থেকে বাঁচানোর কৃতিত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রথমে বলি, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়া বিভিন্ন পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন লকডাউনের জেরে তাঁদের কাজ হারালেন, তাঁরা শিকড়ের টানে স্বভূমিতে স্বাভাবিক কারণেই ফিরতে চাইলেন। এই সময় কেন্দ্রীয় সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে 'শ্রমিক স্পেশাল' ট্রেন চালানোর বন্দোবস্ত করলেন। অবশ্যই বিনা শুল্কে। বিভিন্ন স্টেশনে এই হতভাগ্য মানুষদের খাবার সরবরাহ করা হলো। এর ফলে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলির পরিযায়ী শ্রমিকেরা উপকৃত হলেন। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই 'শ্রমিক স্পেশাল' পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে তো দিলেনই না উপরন্তু একে 'করোনা এক্সপ্রেস' বলে নিদারুণ রসিকতা করলেন। ফলে, পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হলো। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যকে পরামর্শ ও সাহায্য দিল পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে। যে যে

বাংলাদেশের অনুরোধে ভারতে তৈরি করোনা ভ্যাকসিন বিমানযোগে ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে।

রাজ্য তা অনুসরণ করেছে তারা তার সুফলও পেয়েছে।

আবার অসংগঠিত শ্রমিক, ভিখারি এবং আরও অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল মানুষদের জন্য সারা দেশের রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার FCI-এর গুদাম থেকে চাল, গম ও ডালের জোগানও দিয়ে গেছেন। সরকারের প্রচার ও সক্রিয় সহযোগিতায় অনেক NGO ত্রাণ দিয়েছে। এর ফলে ভারতের মতো বড়ো উন্নয়নশীল দেশে লকডাউনে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় নেই। এইসব কারণেই WHO প্রধান টেডরস আধানম গেব্রেসিয়াস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে বলেছেন, ''করোনা মোকাবিলায় ভারত ও তার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অবদানের জন্য অনেক ধন্যবাদ। এই ভয়ানক ভাইরাসের মোকাবিলায় আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।' এই সময় কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কৃষি ফলনের উপর যাতে করোনা অতিমারীর কোনো প্রভাব না পড়ে তার জন্য সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ ও সাহায্য করেছে। আমরা অতিমারীর মধ্যেও তার সুফল দেখেছি। ২০২০ সালে আমাদের দেশের কৃষি উৎপাদনের কোনো ঘাটতি হয়নি। পূর্ণ লকডাউন পদক্ষেপ যে কত কার্যকরী ছিল তার আর একটি প্রমাণ হলো করোনা সংক্রমণের সংখ্যা বড়ো শহরগুলিতে মফস্সল ও গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। এই তথ্য প্রমাণ করে যে জনঘনত্বের সঙ্গে করোনা সংক্রমণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলত সরকারের যে ত্রিস্তর সুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশ— সামাজিক দূরত্ব (সঠিক প্রয়োগে দৈহিক দূরত্ব বলা উচিত), নাক-মুখ বন্ধ মাস্ক ব্যবহার , স্যানিটাইজেশান অনেক কার্যকরী ও সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বহুবিধ বিধানের ফলে আমরা যে শুধু যোগ্যতার সঙ্গে করোনার মোকাবিলা করতে পেরেছি তাই নয়, ন্যূনতম খাদ্য জুগিয়ে দেশের এক বড়ো সংখ্যক মানুষকে রোজগারশূন্য অবস্থায়ও অভুক্ত থাকার হাত থেকে রক্ষা করেছি।

এইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞ দলের একটি উপদেশ, করোনা পজিটিভ হলে নির্দিষ্ট সময় কোয়ারেন্টিনে থাকা— করোনার সংক্রমণের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রভূত সাহায্য করেছে। সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হল, আনলকডাউন পর্বের শুরুতেই অনলাইন সাপ্লাই শৃঙ্খলকে আবার কাজ করার অনুমতি দেওয়া। ফলে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও ওষুধের জোগান অক্ষুণ্ণ রেখে সামাজিক নৈকট্যকে অনেকটাই আটকানো গেছে। আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনা পরিসংখ্যান : আক্রান্ত--১০৯১৩১৫৯৫; সুস্থ হয়ে উঠেছেন--৮১১৬২৫৫৭; মৃত—২৪০৬১১৬। ভারতের ক্ষেত্রে, আক্রান্ত—১০৯০৫১৪২; সুস্থ হয়ে উঠেছেন---১৩৭৫৩৬; মৃত---১৫৫৬৭৩। সুতরাং পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার যে, আক্রান্তের মধ্যে প্রায় ৯৮% মানুষ সুস্থ হয়েছেন। মাত্র ২.২% মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এদের অনেকের মধ্যে অনেক জটিল রোগ আগে থেকেই ছিল যা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। আবার সরকারের আরেকটি দিকও উল্লেখযোগ্য। তা হলো, সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে আনলকডাউনের পথে এগোনো। ফলে আক্রান্তের ২.২% মানুষের মৃত্যু হলেও ভারত সরকারের করোনা মোকাবিলার অভিযানকে বিশ্বসেরা বলতে পারি। আর জন্য WHO থেকে UN সকলের প্রশংসা আমাদের গর্বিত করেছে। এমনকী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ যখন সারা বিশ্বে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, ইউরোপ, আমেরিকা থেকে আফ্রিকা, জাপানে নতুন প্রজাতির (New strain) করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে, তখন ভারত সরকারের সফল নীতির প্রয়োগ (limited exposure to foreign lands) এই দ্বিতীয় ঢেউয়ের সংক্রমণ আমাদের দেশে সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমাদের সঠিক লড়াইয়ের জন্য দেহে এন্টিবডি তৈরী হয়ে গেছে যা করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে আমাদের লড়াইয়ে জয় নিয়ে এসেছে।

এরপর সর্বশেষ লড়াইয়ের কথায় আসি। হ্যাঁ ভ্যাকসিনের কথায়। ভারতে এই মুহূর্তে দুটি ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও অ্যাস্ট্রাজেনিকার সংস্থার সঙ্গে চুক্তিতে টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে 'কোভিশিল্ড' ভ্যাকসিন তৈরি করেছে আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থা পুনের সিরাম ইনস্টিটিউট। এর একটি ফাইলের দাম পরছে $২.৭ অর্থাৎ প্রায় ২১০ টাকা। কিন্তু বিশ্ববাজারে এটি $৪-৫ দামে বিক্রি হচ্ছে। এই কাজ ভারত সরকারের বদান্যতায় সম্ভব হয়েছে। এছাড়া সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে ভারত বায়োটেক তৈরি করেছে 'কোভ্যাক্সিন'। এটির ট্রায়ালের শেষ স্টেজ চলছে। এর দাম কোভিশিল্ডের থেকে খানিক কম। দুটি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ টিকাকরণের জন্য জনপ্রতি দুটি ভায়াল লাগবে। এই দুটি ইনজেকশনের মধ্যে নির্দিষ্ট দিনের অন্তর থাকছে। ডাক্তারদের সঙ্গে ভ্যাকসিন গ্রহীতাদের যোগাযোগ রেখে এগোতে হয়, কারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে যাতে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এই মুহূর্তে বলা যায় যে উল্লেখযোগ্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা নামি মেডিক্যাল জার্নাল lancet ভারতে তৈরি ভ্যাকসিন ও ভারতের করোনা মোকাবিলার প্রশংসা করেছে। এটি যথেষ্ট উৎসাহব্যাঞ্জক। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার করোনা মোকাবিলায় যারা সামনে থেকে লড়াই করেছে সেই মেডিক্যাল কর্মীদের জন্য সর্বপ্রথম ভ্যাকসিনেশান বা টিকাকরণের বন্দোবস্ত করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে অসুস্থ ও বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে টিকাকরণ ব্যবস্থার প্রসারণ করেছেন। এতে করোনা যোদ্ধাদের শুধু যে সরকার সম্মান জানিয়েছেন তাই নয়, তাঁদের টিকাকরণের আর্থিক দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেছে।

আজ ভ্যাকসিন রাজনীতি সারা বিশ্বে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রতিবেশী দেশগুলি---নেপাল, বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কাকে ভ্যাকসিন দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। এই দেশগুলি তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ভারতের ভ্যাকসিন নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী। আর এতে চীন কূটনৈতিকভাবে বেশ অস্বস্তিকর জায়গায় আছে। তারা পাকিস্তানকে ধরেছে যাতে তারা ভারতে তৈরি ভ্যাকসিন না নিয়ে চীনের ভ্যাকসিন নেয়। ইমরান খান এতে সম্মতি জানালেও পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বড়ো অংশ ভারতীয় ভ্যাকসিনে আস্থা রাখতে চাইছে। এমনকী ব্রাজিল ভ্যাকসিন পাওয়ার জন্য ভারত সরকার, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। আমেরিকা ও কানাডাও ভারতের কাছে ভ্যাকসিনের জন্য আবেদন জানিয়েছে। করোনা মোকাবিলায় ভারতের এই সাফল্য স্বাধীনতা উত্তর ভারতের সমাজ, বিজ্ঞান ও কূটনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডুর একটি বক্তব্য দিয়ে শেষ করি, ''যদি করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্ব জয়লাভ করে তবে তা ভারতের জন্যই সম্ভব হবে''।

(লেখক প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক)

কেন্দ্রীয় বাজেটে সড়ক পরিকাঠামোয় ব্যয়বরাদ্দ রাজ্যের উন্নয়নের সহায়ক

অম্লান কুসুম ঘোষ

কোনও দেশ বা রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা যদি উন্নত হয়, তাহলে বিনিয়োগকারীরা আকর্ষিত হয়। বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়ে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আয়বৃদ্ধি হয়। আয়বৃদ্ধি ব্যয়বৃদ্ধির কারণে চাহিদা বাড়ে। চাহিদাবৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটায়। উৎপাদন বৃদ্ধি পুনরায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে আর কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে পুনরায় আয়বৃদ্ধি হয়। একথা অত্যন্ত দুঃখের হলেও সত্য যে স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চাশ বছর আমাদের দেশের পরিবহণ ব্যবস্থার সেরকম উন্নতি হয়নি। উন্নত পরিবহণব্যবস্থা গড়ে ওঠার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামোও তৈরি হয়নি। স্বাধীনতার অর্ধশতক পরে যে অকংগ্রেসি সরকার প্রথম পূর্ণমেয়াদ সম্পন্ন করে তাদের আমলেই দেশের পরিবহণব্যবস্থার উন্নতির দিকে প্রথম নজর দেওয়া হয়। সোনালি চতুর্ভুজ-সহ নানান সড়ক নির্মাণ প্রকল্প দেশের পরিবহণ ব্যবস্থাকে একলপ্তে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছিল, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর প্রভাবও পড়েছিল সদর্থকভাবে। তার পরে একদশক দেশের অর্থনীতি এগিয়েছিল এই সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর ভর করেই। দেশের অন্য সমস্ত রাজ্যের মতো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সড়কগুলিরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের, তৎকালীন রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের কোনও সদর্থক প্রভাব পড়েনি আমাদের রাজ্যের সড়কগুলিতে। আমাদের রাজ্যের সড়কগুলি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছিল। ফলত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতেও হয়নি কোনও ঊর্ধ্বগতি, আসেনি কোনও বড়ো বিনিয়োগ। গোটা দেশ যখন রাজ্যের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, আমাদের রাজ্য তখন পড়েছিল অর্থনীতির চোরাবালিতে।

পশ্চিমবঙ্গের সড়ক পরিকাঠামো ও অর্থনীতিজগতে নবযুগের বার্তা বহন করে আনলো এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট। মহামারী বিধ্বস্ত অর্থনীতির ঘুরে দাড়ানোর উপযুক্ত এবারের বাজেটে সড়কসহ সমস্ত রকম পরিকাঠামো ক্ষেত্রেই ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। ১.০৮ লক্ষ কোটি টাকা মুলধনী বিনিয়োগ করা হয়েছে সড়কপথের জন্য। যার একটি বড়ো অংশ পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয়েছে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ ২৫০০০ কোটি টাকা। মোট রাস্তা তৈরি হবে ৬৭৫ কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গের যে যে প্রকল্পে এই বরাদ্দ হয়েছে সেগুলি হলো—(১) খড়্গপুর—বিজয়ওয়াড়া, (২) ইস্ট-ওয়েস্ট সাব করিডোর, (৩) গোমো-ডানকুনি, (৪) কলকাতা-শিলিগুড়ি আধুনিকীকরণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সড়ক রয়েছে, যার মোট দৈর্ঘ্য সাকুল্যে ২৪২১ কিলোমিটার, অপরপক্ষে ১৫টি বিভাগে মোট ১৬৭টি রাজ্য সড়ক আছে, যার মোট দৈর্ঘ্য সাকুল্যে ৪৫০৫ কিলোমিটার। একলক্ষ বর্গকিলোমিটার আয়তন ও ১২কোটি জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাজ্যের পক্ষে যা খুবই অপ্রতুল। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এক কিলোমিটার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সড়কের ওপর জনসংখ্যার চাপ সতেরো হাজার। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল সড়কের কারণেই পশ্চিমবঙ্গের পণ্য ও মানুষের পরিবহণের গতি এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ঊর্ধ্বগতি দুইই এতদিন ছিল শ্লথতর।

পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি এই বিপুল বরাদ্দ বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটাবে শুধু নয়, বরং এই বিপুল বরাদ্দকৃত কাজের জন্য যে বিপুল কর্মী নিযুক্ত হবে তা পশ্চিমবঙ্গের সরাসরি কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ কাজে লাগিয়ে কোনও রাজ্য সরকার নিজেদের রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়, কোনও রাজ্য সরকার সেই বরাদ্দের অকারণ বিরোধিতা করে নিজের রাজ্যের ক্ষতিসাধন করে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকে কীভাবে কাজে লাগানো হয় তার ওপরই নির্ভর করে রাজ্যের ভবিষ্যৎ। তাই এখন রাজ্যবাসীকেও বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আগামীদিনে কোন দলের সরকারের হাতে তারা ক্ষমতা তুলে দেবে। অকারণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করে রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে সেরকম সরকারের হাতে না কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে রাজ্যকে উন্নতির রাজপথে নিয়ে যাবে সেরকম রাজ্য সরকারের হাতে।

(লেখক স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের প্রান্ত সংযোজক)

উন্নয়নের কাণ্ডারি নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী

সুজিত রায়

কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে খাপখোলা তরোয়াল, কারও হাতে ঠগির ফাঁসের দড়ি, কারও হাতে দেশি পিস্তল, কারও মুখে 'খেলা হবে' স্লোগান। কারও মুখে নর্দমার পঙ্কিল স্রোতের মতো কুকথা, অশ্রাব্য গালি, কারও হাতে নীল সাদা রঙের ফ্ল্যাগ। কারও হাতে দেশদ্রোহের পতাকা সততই উদ্যত, উদগ্র, চরম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কেউই প্রতিপক্ষ মানুষটাকে প্রশ্ন করতে সাহস করছে না, ''রাজা তোর কাপড় কোথায়?'' কারণ তাদের নিজেদের পরনেই কাপড় নেই, তারা উলঙ্গ। হ্যাঁ, ভারতবর্ষের রাজনীতির মঞ্চে মোদী-বিরোধী সমস্ত মুখ এখন মুখোশ মাত্র। এতদিন তারা কেউ লাল জামা গায়ে, কেউ নীল জামা গায়ে ধর্মনিরপেক্ষ জনব্রতীর ভূমিকায় নাটক জমাতে উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি মাত্র সাত বছরেই দেশের ১৩৫ কোটি মানুষের সামনে প্রমাণ করে দিয়েছেন, ওই রঙিন জামা পরা বিরোধী লেঠেলগুলি ছিল আসলে সার্কাসের জোকার। রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ওদের মুষ্টিবদ্ধ হাত আর শক্ত চোয়ালকে আলগা করে দিয়েছে। মুখোশের আবরণ খসে পড়ছে। চাবুকের মত দুরন্ত গতি এখন শ্লথ। কারণ দেশের মানুষ জেনে গেছে ওগুলো কোনও রাজনৈতিক দল নয়। সবই সার্কাস পার্টি। বিনোদন দিতে ক্যাম্প খাটায় তারপর বসন্তের কোকিলের মতই উধাও হয়ে যায়। আর নরেন্দ্র মোদী রাণাপ্রতাপের ঘোড়া চৈতকের মতো টগবগে উৎসাহ নিয়ে একাই ছুটিয়ে দেন রথ।

২০১৪-র সাধারণ নির্বাচনে প্রথম নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ ঘোষণা করে বিজেপি এককভাবে পেয়েছিল ২৮২ টি আসন। বিরোধীরা হালে পানি পাননি, তাঁরা সমস্বরে, মধ্যযামিনীর জান্তব হল্লা তুলেছিলেন সমস্বরে, '৩১ শতাংশ মানুষের রায়ে নির্বাচিত বিজেপি সরকার গড়বে কোন অধিকারে? ৬৯ শতাংশ মানুষের রায়কে অস্বীকার করা হবে কেন'? কিন্তু ওই হল্লার মুখে কালি মাখিয়ে মোদী জমানা ২০১৯-এ যখন ফিরে এল শুধু ৩০২ আসন নিয়েই নয়, অনেক বেশি শতাংশ মানুষের সমর্থন নিয়ে, তখন বিরোধীদের যুক্তি, তর্ক, মিছিল, সমাবেশ সবকিছুই ভ্যানিশ হয়ে গেল রাতারাতি।

বিরোধীরা স্বীকার করুন কিংবা না করুন বাস্তব ছবিটা ছিল উন্নাসিকদের কাছেও বিস্ময়কর। কারণ হাজার বিরোধিতার মধ্যেও মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১৪ সালেই ভারতবর্ষে প্রথম একটি প্রত্যয়ী সরকারের ফলক স্থাপন করেছেন। যে প্রত্যয় স্পষ্ট করেছিল, ৭২ বছরের স্বাধীন ভারত এবারই প্রথম প্রকৃত উন্নয়নের পথে পা রাখবে।

প্রথম পদক্ষেপটা ছিল জনধন যোজনা। লক্ষ্য ছিল, অতি দ্রুত দেশের অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া অনাধুনিক জনসমাজের হাতে একটি করে ব্যাঙ্কের পাশবই ধরিয়ে দেওয়া। কারণ ব্যাঙ্ক পরিষেবা মানুষকে আর্থিক সক্ষমতা দেয়। অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার পঙ্গুত্ব থেকে মুক্তি পায় মানুষ। মাত্র ১২ টাকায় রাতারাতি কয়েক কোটি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেল। ২০১৪-র ২৮ আগস্ট ওই যোজনার সূচনার দিনেই শুরু হয়েছিল স্কিল ইন্ডিয়া মিশন। লক্ষ্য ছিল ভারতীয় যুবক-যুবতীদের মধ্যে থেকে প্রতিভাবানদের খুঁজে বার করা। পরবর্তী এক মাসের মধ্যেই ২৮ সেপ্টেম্বর সূত্রপাত হল 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের। লক্ষ্য, শিল্পোৎপাদনে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা। প্রতিটা প্রকল্পই ছিল নয়া ভাবনার দ্যোতক। হয়তো-বা নয়া ভারতের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এক একটি

হলদিয়ায় ভারত পেট্রোলিয়ামের টারমিনাল উদ্বোধনে শ্রীমোদী।

বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

কিন্তু ২ অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিনে স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্প ঘোষণা করে মোদীজী চমকে দিলেন ভারতীয় রাজনীতিতে ৭২ বছর ধরে মৌরুসিপাট্টা গেড়ে বসা কংগ্রেসকে। কারণ এমনভাবে গান্ধীজীর চশমাকে প্রকল্পের লোগো বানিয়ে নির্মল ভারত মিশনের স্বপ্নও দেখেনি কংগ্রেস। স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন গ্রামে-গ্রামে জন শৌচালয়, মানুষের ঘরে ঘরে আধুনিক শৌচালয় ভারতের নারী সমাজের আব্রু রক্ষায় এগিয়ে এল। ১৯ অক্টোবর শুরু হলো ভারতবর্ষের গ্রামীণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের যোজনা—সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা। ১৬ অক্টোবর রচিত হলো এক নয়া ইতিহাস। শ্রমিক জয়তে যোজনা। অর্থাৎ শ্রমিক কল্যাণে একগুচ্ছ সংস্কার। ইন্সপেক্টর রাজ ও জটিল শ্রমবিধির জমানার বদলে বিনিয়োগমুখী শিল্প পরিবেশের ভিত গড়ে তোলা। এই বিস্ময়কর গেম চেঞ্জার প্রকল্পটির গায়ে গায়েই এল এক ঐতিহাসিক পরিকল্পিত যোজনা—'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'। লক্ষ্য একটাই, ছাত্রী ও যুবতীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভরতা ও শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হবার পথে এগিয়ে দেওয়া। পাশাপাশি ঘোষিত হলো—প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা। সহজ কিস্তিতে আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষকে শ্রমের পথে প্রতিষ্ঠা করা। ১ মে শ্রমিক দিবসে দেশের মায়েদের রান্নাঘরের বিষাক্ত ধোঁওয়া থেকে মুক্তি দিতে মোদীজীর হাত ধরে এল উজ্জ্বলা যোজনা। কম মূল্যে গরিব মায়েদের হাতে হাতে পৌঁছে গেল রান্নার গ্যাস, এল ই ডি আলো। ৯ মে চালু হল অটল পেনশন যোজনা। ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সি সব মানুষের জন্য অবসরকালীন ভাতা দেওয়ার প্রকল্প। একইদিনে প্রধানমন্ত্রী মাত্র ৩৩০ টাকা প্রিমিয়ামে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সি মানুষজনের জন্য চালু করলেন ২ লক্ষ টাকার জীবন বিমা প্রকল্প। আর বছরে মাত্র ২ টাকা প্রিমিয়ামে ১৮ থেকে ৭০ বয়সি মানুষের জন্য দুর্ঘটনা বিমা। এর আগে এমনভাবে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি কেন্দ্রের কোনও সরকারই, যেখানে মানুষকে সাহায্যের নামে ডোল রাজনীতি প্রশ্রয় পায় না। অথচ মানুষ ফিরে পায় বেঁচে থাকার আশ্বাস, আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার সাহস। ২০১৭-র ২৬ জুন চালু হল স্মার্ট সিটি প্রকল্প। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী গোটা দেশকে সোনালি চতুর্ভুজ প্রকল্পের পরিকাঠামো উপহার দিয়েছিলেন। মোদীজী এগোলেন আর এক ধাপ। দেশের ১০০ শহরকে আধুনিকতম এবং সমস্ত সুযোগ সুবিধাযুক্ত যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার প্রকল্প গ্রহণ করলেন। একই সঙ্গে চালু হলো অটল অমৃত যোজনা। আর ২ জুলাই এসে গেল সেই বহু প্রতীক্ষিত ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন প্রকল্প যা মানুষকে আধুনিক ডিজিটাল বিশ্বের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত মিলিয়ে চলতে সাহায্য করল। মোদী প্রশাসনের প্রথম পাঁচ বছরেই এমনভাবেই

মাদ্রাসা শিক্ষায় মুসলমানদের কোনো উন্নতি হয়নি— আলি হোসেন

যদি প্রশ্ন করা হয়, মাদ্রাসা শিক্ষায় কি মুসলমানদের উন্নতি হয়েছে? উত্তর হবে, না, না— উন্নতি হয়নি। এই শিক্ষায় কোনোকালেই মুসলমান ভাইদের উন্নতি হবে না। স্বাধীনতার আজ প্রায় ৭৪ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এই সময় কালের মধ্যে কংগ্রেস ৩০ বছর, বামফ্রন্ট ৩৫ এবং টিএমসি ১০ বছর শাসন করেছিল এবং করছে। কোনো শাসকই মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে নজর দেয়নি। তারা শুধু তাদের ভোটব্যাঙ্ক করে রেখেছে। প্রতি বছর মাদ্রাসার নিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। প্রতিযোগিতা করে নতুন মাদ্রাসা অনুমোদন করছে। বাম সরকার যদি ২০০ নতুন মাদ্রাসা অনুমোদন দেয় তো টিএমসি সরকার ৫০০০ অবৈধ খারিজিয়া মাদ্রাসার মদত দিচ্ছে। কোনোদিন মুসলমান সমাজ আধুনিক হোক সে বিষয়ে এদের নজর ছিল না। যার ফলস্বরূপ আমরা দেখছি মাদ্রাসাগুলো থেকে এএলআইএম, এফএজেডইএল, টিআইটিইএল এবং এমএম ডিগ্রি নিয়ে পাশ করে হাজার হাজার বেকার মুসলমান মৌলবি ভাই সমাজে বোঝা হয়ে রয়েছে। এদের কোনো কর্মসংস্থান নেই। তাই এরা ঝুঁকছে মসজিদের ইমাম বা মোয়াজ্জেন হওয়ার জন্য। আমার বক্তব্য, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান কম যে আছে তা নয়, অনেক আছে এমএ, বিএ পাশ করা শিক্ষিত মুসলমান। তারা কেন চুপ করে আছেন? কেন প্রতিবাদী হয়ে উঠছেন না? শিক্ষিত মুসলমানদের নীরবতা ভাবাই যায় না! এভাবে মুসলমান সমাজকে পরিকল্পনা করে মূর্খ করে রাখা হয়েছে। মুসলমানদের নিয়ে ভোটের রাজনীতি করেছে বামেরা এবং এখন করছে মমতা সরকার। এভাবে চলতে পারে না।

মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য তাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শামিল করতে হবে। এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে কমপিউটার তুলে দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে আত্মনির্ভর করতে হলে মুসলমানদের বিকাশ ঘটাতে হবে সার্বিক ভাবে। গুজরাট সরকার যদি মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ও চাকুরির ব্যবস্থা করতে পারে পশ্চিমবঙ্গ পারবে না কেন? পশ্চিমবঙ্গও পারবে— ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারই পারবে।

(লেখক রাজ্য বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি)

একের পর এক এসেছে বহু তাক লাগানো প্রকল্প— স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, সেতু ভরতম যোজনা, গ্রামোদয় সে ভারত উদয় প্রকল্প, নির্মল গঙ্গা যোজনা, জন আরোগ্য যোজনা, কৃষক সম্মান নিধির মত হাজারো জনহিতকর প্রকল্প যা গোটা দেশের সর্বস্তরের সর্ববয়সের মানুষকে আশ্বস্ত করেছে যে দেশ দ্রুত ধাবমান এক নতুন ভারতবর্ষের লক্ষ্যে।

২০১৯-এর নির্বাচনে বিপুল সমর্থন পাওয়ার পিছনে কাজ করেছিল এই সব প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণ । ২০১৯-২০-র সাধারণ বাজেটও তৈরি হয়েছিল একটি দীর্ঘমেয়াদি বাজেটের অঙ্গ হিসেবে। সেটির লক্ষ্য ছিল, ২০৪৬ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার শতবর্ষে পা রাখবে সেদিন যাতে গোটা বিশ্ব তাকিয়ে থাকে ভারতবর্ষের দিকে। মুগ্ধ হয় গোটা পৃথিবী। আর দেউলিয়াপনায় বিধ্বস্ত বিরোধীরা জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকে মোদীর ভারতবর্ষের দিকে।

কিন্তু বিধি বাম। কালান্তক ভাইরাস কোভিড-১৯-র আচমকা হানায় গোটা বিশ্বের মতো ভারতও প্রায় টানা একবছর আটকে রইল এক আজানা আতঙ্কে। ডিমনিটাইজেশন এবং জিএসটি প্রকল্প লাগু করে যে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা থেকে দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী, সেই প্রচেষ্টা তীব্রভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো। সরকারের নজর ঘুরতে বাধ্য হলো দেশের মানুষের প্রাণ রক্ষায়। বিরোধীদের হেঁড়ে গলা আবার সরব হলো। মোদীর নিন্দায় কান পাতা দায় করে তুলল তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা সিপিআইএমের মতো নেতিবাচক রাজনীতির শরিক দলগুলি। কিন্তু মোদী থেমে থাকেননি। ১৩৫ কোটি মানুষের দেশে যেভাবে এই কালান্তক ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, মোদীজীর বাস্তববাদী পরিকল্পনা সেই সম্ভবনার মুখে ছাই দিয়ে, বিরোধীদের সমস্ত নেতিবাচক সমালোচনার জবাব দিয়ে দেশের সিংহভাগ মানুষকেই সুস্থ রাখতে পেরেছেন। একবছর পার হওয়ার আগেই দেশে তৈরি হয়েছে ভ্যাকসিন। যা চমকে দিয়েছে গোটা বিশ্বকে। এখন ওই ভাইরাসের আক্রমণ নিম্নমুখী, কারণ ভাইরাসটি দ্রুত শক্তি হারাচ্ছে। মানুষও সচেতন জীবনযাপন করছে। ইতিমধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক হাল ফিরিয়ে আনতে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। চলতি আর্থিক বছরে বাজেট পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়ার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে দেশকে জাতীয় গড় উন্নয়নের পথে পৌঁছে দিতে বেশি সময় লাগবে না। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারসহ বহু সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক সমীক্ষায় পুর্বভাষ মিলেছে ২০২১-২২-এর ভারতবর্ষ পৌঁছে যাবে আর্থিক সক্ষমতার পথে।

সরকারের সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফলও মিলতে শুরু করেছে। জাপান, কোরিয়া-সহ একাধিক দেশ ভারতবর্ষে শিল্প-কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চীন দেশ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে বেশ কয়েকটি উৎপাদক সংস্থা এবং তাদের পরিপূরক সংস্থাগুলি। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারও নানারকম সুযোগ-সুবিধার ডালি সাজিয়ে তুলে দিতে প্রস্তুত। কারণ মোদীজী জানেন হাল ফেরাতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে। সাহস রাখতে হবে। নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন না দিয়ে বিদেশের লগ্নি ভারতবর্ষে টেনে আনতে হবে। সেখানে মূল লক্ষ্য থাকবে দুটি— অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। কারণ আদ্যোপান্ত জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সার্বভৌমত্বে আস্থাশীল নরেন্দ্র মোদীজী জানেন, এই যে শতাধিক উন্নয়ন প্রকল্প সবই অর্থহীন হয়ে যাবে যদি দেশের জাতীয় স্বার্থকে বিদেশি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বিলিয়ে দেওয়া হয়। তাই অর্থনীতির পাশাপাশি মোদীজী চালু করেছেন 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত', 'স্বদেশ দর্শন'-এর মত প্রকল্প। যা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিকশিত করবে। নারীশক্তিকে জাগ্রত করতে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও, উজ্জ্বলা যোজনা, তিনতালাক আইন বাতিল করার মতো প্রকল্পগুলি যেমন দেশের সাংস্কৃতিক শক্তির অপচয় রুখতে সাহায্য করেছে, তেমনি নির্মল গান্ধী মিশন প্রকল্প ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিকেও সংহত করে তুলছে।

ভারতবর্ষে অন্যান্য সরকারগুলির উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকল্প রূপায়ণ প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। ছিল ঘুষের রাজনীতি, তোষণের রাজনীতি। যার ফলে মানুষ স্বনির্ভরতার চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল। ভরতুকির রাজনীতি কখনও কোথাও দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে সাহায্য করতে পারে না। বিদেশি আর্থিক সাহায্যও দেশকে ভিখারিতে পরিণত হতেই সাহায্য করে। প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চরমভাবে ক্ষতি করে দেশের আঞ্চলিক সীমানা এবং জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করতে।

নরেন্দ্র মোদী এই বিষয়গুলিতে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই বিশ্বের প্রায় সব দেশই আজ ভারতের বন্ধু, শুধু পাকিস্তান ও চীন ছাড়া। তাই মোদীর ভারত হলো আত্মশক্তির ভারত। আত্মনির্ভরতার ভারত। মোদীর ভারত বিশ্বের প্রাচীনতম সংস্কৃতি হিন্দুত্বের ভারত, আত্মসংকল্পের, আত্মপ্রতিশ্রুতির ভারত।

বিরোধীদের হাজার চক্রান্ত, হাজারো জোটের ঘোঁট, স্বঘোষিত হুক্কাহুয়া ধ্বনি, হাজারো রঙ্গোলির রং ছোঁয়ানো রাজনৈতিক পতাকা, মিথ্যাচার, চক্রান্ত—সবই উবে যাবে এক আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায়। সে প্রদীপের নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। নয়া ভারতের রূপকার। বিশ্বের দরবারে এক নয়া দর্শন এবং নয়া দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক পরিবেশক।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং গবেষক)

মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবার কথা বিজেপি ছাড়া আর কেউ ভাবেনি

কেন্দ্রের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া সম্প্রদায়কে তথা উদ্বাস্তুদের সবথেকে বেশি উপকৃত করবে। তাই মতুয়া সম্প্রদায় এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সুফল আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়া অধ্যুষিত ৪০ থেকে ৪৫ বিধানসভা কেন্দ্রে পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলবে এবং আরও ৩০টি কেন্দ্রের যেখানে মতুয়ারা অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় আছে সেখানেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে।

লাইলাক বিশ্বাস

২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বর লোকসভায় এবং ১১ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় পাশ হয়ে ১২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে বহুল চর্চিত ও বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি আইনে পরিণত হলেও বিতর্ক আজও পিছু ছাড়েনি। আবার করোনা মহামারীর জন্য এই আইন এখনো কার্যকরী হয়নি।

আইনের বিষয়ে আলোচনার আগে একটু দেখে নেওয়া যাক এই আইনের বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় যারা উপকৃত হবেন সেই মানুষগুলি কারা এবং তারা কোন অতীত ইতিহাসের স্মারক বহন করে চলেছেন।

বড়মা বীণাপাণি দেবীর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী।

মতুয়া শব্দটির সঙ্গে বর্তমানে পরিচিত নন এমন মানুষ পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যাবে না। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি গ্রামে হরিচাঁদ ঠাকুর এই ধর্মমতের প্রবর্তন করেন এবং প্রচার শুরু করেন। প্রধানত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ এই ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাণ্ডবনৃত্যে কীর্তন করতে করতে হরিবোল ধ্বনি দিতে দিতে তারা আধ্যাত্মিক ভাবে কোনো এক মুক্তির পথ হয়তো খুঁজে পেতেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের পর তার পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়াদের গুরু হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের শিক্ষা গ্রহণ এবং একতাবদ্ধ হবার উপদেশ দিতেন। ফরিদপুর ও তার আশেপাশের অঞ্চলের নমঃশূদ্র শ্রেণীর মানুষেরা হরিচাঁদ ঠাকুরের এই ধর্মমত সহজে গ্রহণ করলেন, কারণ তাদের সহজ-সরল জীবনের সঙ্গে এরকম উপাসনা পদ্ধতি খুব সহজেই মানিয়ে যায়। তারা সারাদিন কাজকর্ম করতেন এবং সন্ধ্যাবেলায় তারা খোল-করতাল-ডঙ্কা ইত্যাদি বাদ্য সহযোগে তাণ্ডবনৃত্য-সহ হরিবোল বলে কীর্তন করতেন। এতে তাদের মানসিক শান্তি বিরাজ করতো। নির্ঝঞ্ঝাট পরিশ্রমী মানুষগুলো একসময় দেখল তাদের আশেপাশের পরিবেশ আর তাদের জন্য বাসযোগ্য নেই। কখন যে একটু একটু করে ইসলামি আগ্রাসন তাদের সুস্থ জীবনযাত্রার অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছে তা তারা বুঝতে পারেননি। নিঃশব্দে নিভৃতে এই মানুষেরা একে একে চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এলেন এপার বাঙ্গলায়। ১৯৫০ সালের নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি হলেও পাকিস্তান তা সঠিকভাবে পালন করেনি, যদিও ভারত সরকার সেটা সঠিকভাবে পালন করে এবং ভারতবর্ষের বুকে সংখ্যালঘু শ্রেণীর অধিকার এবং স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের অবস্থা (অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, শিখ, জৈন, পার্সিদের অবস্থা) দিন দিন খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে শুরু করে।

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের গদিতে বসে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। তার ফলে ১৯৭১ পরবর্তীকালে যে সমস্ত মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আসেন তাদের নেহরু-লিয়াকত চুক্তির

ফ ঃ ৮

মতুয়াদের শোভাযাত্রার নেতৃত্বে বাবুল সুপ্রিয় ও শান্তনু ঠাকুর।

আওতায় নাগরিকত্ব প্রদান করা বা তাদের অধিকার রক্ষা করা আর সম্ভব হয় না। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের ভারতে আসা বন্ধ হয় না। ভারত সরকারের কাছে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় যে এই মানুষদের কী হিসেবে বিবেচনা করা হবে— শরণার্থী না অবৈধ অনুপ্রবেশকারী?

অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত প্রধানত শ্রমজীবী বা চাষি ক্ষেতমজুর শ্রেণীর এইসব মানুষ নিজের অধিকার বা শরণার্থীর অধিকার বা ইউ এন এইচ সি আর ইত্যাদির কোনো কিছুই জানত না। তারা প্রাণ বাঁচিয়ে, ধর্ম বাঁচিয়ে, মা-বোনের ইজ্জত বাঁচিয়ে অথবা বাঁচানোর জন্য যখন আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে পা দেয় তাদের কাছে শুধুমাত্র একটু আশ্রয় আর যেকোনোভাবে কোনো একটা কাজ করে পরিবার পালন করার সুযোগটুকুই যেন উপরি পাওনা। তাদের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল মতুয়া সম্প্রদায়কে তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছে। সর্বপ্রথম কংগ্রেস এই খেলা শুরু করে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে বিধানসভায় দাঁড় করিয়ে। তারপর বাম আমলে দীর্ঘদিন ঠাকুরবাড়ির রাজনৈতিক গুরুত্ব কম থাকে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ঠাকুরবাড়িকে পুনরায় রাজনীতির অঙ্গনে নিয়ে আসে এবং মতুয়াদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করে। বর্তমানকালে বঙ্গ রাজনীতিতে ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয়।

মতুয়া ভোটব্যাঙ্ককে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করলেও কোনো রাজনৈতিক দল এদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেনি। খুব গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে মতুয়াদের প্রায় সকলেরই ভোটার কার্ড আছে কিন্তু সবার কাছে কাস্ট সার্টিফিকেট বা রেশন কার্ড বা অন্যান্য পরিষেবা পাওয়ার মতো কাগজপত্র নেই। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলির প্রয়োজন ছিল শুধুমাত্র এই মানুষদের ভোট। এদের কিছু দেওয়ার বা ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়ার দায় কেউ নিতে চায়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে এই শরণার্থীদের অনেকেই রেশন কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট বা অন্যান্য পরিষেবা প্রাপ্তির জরুরি কাগজ পেয়েছেন। আবার প্রচুর শরণার্থী আছেন যারা কোনো কাগজ পাননি। কেউ কেউ দু-একটা পেয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় সরকারি খাস জমিতে রেললাইনের পাশে ঝুপড়ি বানিয়ে অতি কষ্টে জীবনযাপন করে চলা এই মানুষগুলোর কষ্ট পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলিকে সমব্যথী করে তুলতে সম্ভবত ব্যর্থ হয়।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পর উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রথম চিন্তাভাবনা শুরু হয় সরকারি স্তরে। ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার মোদী সরকার গঠন হওয়ার পর বেশকিছু যুগান্তকারী ঐতিহাসিক বিল পাশ করানো হয়, তারমধ্যে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অন্যতম।

এই আইন পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা ৬টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের ভারতে নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেবে। এমনকী যদি কারো নামে অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত মামলা থাকে তাও এই আইন বলবৎ হবার সঙ্গে সঙ্গে খারিজ হয়ে যাবে। এই আইন মতুয়া তথা নমঃশূদ্র শ্রেণীর মানুষের ভারতের বুকে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড়ো সহায়। এই আইন পাশ হবার পর দীর্ঘদিন ধরে মতুয়াদের ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে আসা রাজনৈতিক দলগুলি মতুয়াদের মনের রাজনৈতিক মাটি হারাতে শুরু করেছে, কারণ 'তোমাদের নাগরিকত্বের ব্যবস্থা করে দেব' বলেই তারা ভোট চাইতো।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সিডিউল কাস্ট শ্রেণীর মধ্যে মতুয়ারা দ্বিতীয় বৃহত্তম। উত্তর ২৪পরগনা, দক্ষিণ ২৪পরগনা, নদীয়া, হাওড়া, কুচবিহার, মালদা ইত্যাদি জেলায় মতুয়ারা ছড়িয়ে আছে এবং রাজ্য সরকারের হিসেব অনুযায়ী এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৭ শতাংশ ভোটার মতুয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে।

কেন্দ্রের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন যেহেতু সরাসরি মতুয়া শ্রেণীকে প্রভাবিত করে এবং তাদের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করে, তাই মতুয়া সম্প্রদায় এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সুফল আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়া অধ্যুষিত ৪০ থেকে ৪৫ বিধানসভা কেন্দ্রে পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলবে এবং আরও ৩০টি কেন্দ্রের যেখানে মতুয়ারা অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় আছে সেখানেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে। কারণ এই আইন পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া সম্প্রদায়কে তথা উদ্বাস্তুদের সবথেকে বেশি উপকৃত করেছে। এই ভোট যে এবার বিজেপির পক্ষেই যাবে তা নিয়ে বিশেষ সংশয় কারো হয়তো নেই। আর এই জন্য উদ্বাস্তু তুষ্টিকরণের জন্য বা মতুয়া তুষ্টিকরণের জন্য ঠাকুরনগরে হরিচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার চেষ্টা রাজ্য সরকার শুরু করেছে। বিজেপির নাগরিকত্ব আইনের সুফল এখনও মতুয়াদের হাত হাতে অধরা, তাই এই বিশাল অঙ্কের জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন কোন দলের ভোটবাক্সে কতটা পড়বে তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েক মাস। এই ১৭ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ভোট আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে প্রতিফলিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং সমাজসেবী)

বিদ্যুতায়নেও বিপ্লব ঘটিয়েছে মোদী সরকার

শেখর সেনগুপ্ত

বাল্যকালের প্রথমাংশ আমার কেটেছে পূর্ব বর্ধমানের শহরসংলগ্ন গ্রাম তেজগঞ্জে--- যেখানে ঐতিহাসিক বিদ্যাসুন্দর কালীবাড়ি অবস্থিত। জনসংখ্যা যতই হোক, পথঘাটের দুরবস্থা কহতব্য নয় এবং সবচেয়ে পীড়াদায়ক সেই কংগ্রেসি রাজত্বকাল থেকেই সূর্য ডুবলে চরাচর ঘন অন্ধকারে আপ্লুত। সব বাড়িতেই লম্ফ ও হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো। প্রাতঃভ্রমণে নির্গত আলোচনারত একজন বৃদ্ধও বিদ্যুতের প্রসঙ্গ তুলতেন না, যেহেতু তাঁদের প্রত্যেকেই জানতেন, সরকার এই বিষয়ে কী নির্মমভাবে উদাসীন! কাঁচা পথ, কাঁচা নালা এবং বিদ্যুতের 'ব' নেই। সেই গ্রামেই ২০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি একজন প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে গেলাম এবং হতচকিত হয়ে দেখলাম, চারিদিক বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত এবং অধিকাংশ সড়কই পাকা, যদিও সংস্কারের ও মেরামতির অভাবে সেখানে বিস্তর ভাঙচুর। আমার এই অভিজ্ঞতা এবং স্বীকারোক্তিতে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই। অর্থাৎ গত কয়েক বছর ধরে দেশের উন্নয়ন প্রবাহ চলেছে পূর্ণগতিতে— যেখানে হতাশা, ডিপ্রেশনের অবকাশ কম। আমি রাজনীতির মানুষ নই। আর যে পদমর্যাদায় অবস্থান করেছি দীর্ঘকাল, যেখানে প্রত্যক্ষ রাজনীতি করবার অধিকারও আমার ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে অকপটে স্বীকার করছি, দেশে সার্বিকভাবে এহেন উন্নয়নের প্লাবন শুরু হয়েছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়কাল থেকেই এবং এখন তা এক সমুন্নত শীর্ষকে স্পর্শ করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বে। আমি আজ কেবল ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার বিষয়েই কিছু তথ্যভিত্তিক আলোচনা করবার চেষ্টা করছি।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে লালকেল্লা থেকে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি ভারতব্যাপী ডিজিটাল সংযোগ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এরজন্য সর্বাগ্রে যা দরকার, তা হলো সর্বাত্মক বিদ্যুতায়ন। তাই দেশের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার শপথ নিলাম

2 & 3 BHK Flats | Complex of 8 Blocks | 80 Premium Apartments

A.C. Community Hall | Rooftop Garden | Gymnasium

983 044 8888
www.edengroup.in
HIRA/P/SOU/2020/001104 | www.hira.wb.gov.in

EDEN
Belvedere
YOUR NEXT HORIZON
Behind 1B Bus Stand, E.M. Bypass

আজ। এর জন্য আমি সময় চাইছি এক হাজার দিন। এই সময়সীমার মধ্যে ভারতের একটি গ্রামকেও অন্ধকারে থাকতে দেবো না আমরা।' ভাবলে অবাক হতে হয়, মোদীজীর ওই ঘোষণার পর ঠিক ৯৯৫ দিনের মাথায় অর্থাৎ ২৮ এপ্রিল, ২০১৮ সালে ভারতের একশো শতাংশ গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ বাস্তবায়িত হয়ে গেল। এটা যে একটা মহান অথচ নীরব বিপ্লব, আমরা ক'জনই বা তার মূল্যায়ন করে থাকি? পরিবর্তে মিথ্যা, অর্ধ-মিথ্যা দোষারোপে মানুষকে প্ররোচিত করতে কিছু নেতা-নেত্রীর নর্তন আমাকে হতবাক করে দেয়। রাজনীতিতে এই রকম মিথ্যাচারের অবসান ঘটবে কবে? বার্নার্ড শ-এর একটি বিখ্যাত কটূক্তির কথা স্মরণে আসে মাত্র।

২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট অবধি দেশের রাজ্যগুলি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট মোতাবেক অন্ধকারে ডুবন্ত গ্রামের সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৪৫২টি। প্রধানমন্ত্রীর 'প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি হর হর ঘর যোজনা'র দৌলতে ভারতের গ্রামাঞ্চলে আজ প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে বিদ্যুতের আলো। এই প্রাপ্তিতে রয়েছে প্রকৃত সাম্য— গ্রামের সম্পন্ন ভূস্বামী থেকে শুরু করে একজন দরিদ্র ভাগচাষি অবধি সকলের নিবাসই আলোকিত। নির্বিচারে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার এত বড়ো নজির বিশ্বের আর কোনও দেশে ঘটেনি।

'দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা' দেশের গ্রামগুলির মধ্যে যে আলোকসঞ্চার ঘটিয়েছে, মানব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা এমন এক নজির, যার তুলনা অতীতে নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। আমি প্রত্যয়ী যে এই কথাগুলির মধ্যে একটিও রাজনীতিচর্চিত অতিরঞ্জিত নয়। এই প্রকল্প খাতে ব্যয় করবার জন্য ভারত সরকার সব রাজ্যকে মোট যে টাকা বরাদ্দ করেছিল, তার পরিমাণ ৫১,৪৯৫ কোটি। কেন্দ্রের দিকে কথায় কথায় যাঁরা তর্জনী তোলেন, তাঁদেরও অবগতির জন্য আমার আজ এই কলম ধরা।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক)

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কোন রাজ্যে কত বাড়ি

রাজ্য/শহর	বাড়ি তৈরির অনুমোদন	কাজ চলছে	মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৫৯৮	৩৮	২৫
অন্ধ্রপ্রদেশ	২,০২১,৪২৭	৫৮০,৪৬৪	৩৪৯,০৯৪
অসম	১২২,৪৩১	৮৯,৫১২	২২,২৪৮
বিহার	৩৬০,১২৬	১৮১,৫৪৬	৭৪,১৬৮
চণ্ডীগড়	৬৩৭	৫,৫৯৭	৫,৫৯৭
ছত্তিশগড়	২৬০,২৫৮	১৯৮,১৫০	১০৮,৭৭৬
দাদরা এবং নগর হাভেলি এবং দমন দিউ	৬,৮১৪	৬,৩৪৯	৪,২৩১
দিল্লি	২১,৬৮৩	৬২,২৬৩	৪৫,৬৬৩
গোয়া	১,৫০৩	১,৪৪৫	১,৪৪৪
গুজরাট	৭৩১,৯১১	৬৪৯,৫২১	৪৬৩,৬০১
হরিয়ানা	২৭৭,২৭৮	৬১,৯৭৭	৩১,৩৮৫
হিমাচল প্রদেশ	১০,৭৮০	৯,০৫২	৪,১০৮
জম্মু ও কাশ্মীর	৫৫,১৮৫	৩০,৩৪৫	৮,৮৩৩
কর্ণাটক	৬৬৪,৬১৪	৪১১,৭২২	১৯৮,৫১৯
কেরল	১২৩,০৬৩	১০৮,৭৯৩	৮২,৮৯৩
লাদাখ	১,৭৬০	৯৫৯	৩৫৯
মধ্যপ্রদেশ	৮১০,৫৯৯	৬৯৬,৬৬০	৩৫৬,০৬৪
মহারাষ্ট্র	১,২৭০,৯৪৯	৫৯৩,৯৪৮	৩৮৭,৫০১
মণিপুর	৫০,১৭৩	৩৪,৬৭১	৪,৬৬৬
মেঘালয়	৪,৭০১	১,৬০৫	১,০২৪
মিজোরাম	৩৫,২৩১	১৩,০৬৮	৩,৫৩৫
নাগাল্যান্ড	৩২,০০৩	২২,০৭১	৪,২৪৩
ওড়িশা	১৫৬,৮০৩	১১৩,৩৩৫	৭৫,২৭৪
পণ্ডিচেরি	১৩,৭৩৩	১৪,৬৯২	৪,১৯৭
পঞ্জাব	৯৯,৯১৪	৫৮,৫০৩	৩২,৩৫১
রাজস্থান	২২২,৬৮৭	১৩৬,৯২৯	১১১,৫৩৯
সিকিম	৫৬৭	৫৩৯	২৭৪
তামিলনাড়ু	৬৯০,৫৬৮	৬৩১,৫৮৫	৩২৯,৩৯৯
তেলেঙ্গানা	২০৩,৭১১	২০২,৯২২	১৩৫,৮৩৩
ত্রিপুরা	৮৫,৭৮৩	৫৮,১৫৮	৪৩,৬২৭
উত্তরপ্রদেশ	১,৭৫৮,৬২০	১,১৯৩,৩৫৬	৬৪১,৭৬৩
উত্তরাখণ্ড	৩৯,৯৬৩	২৩,৮৪৩	১৭,০২৮
পশ্চিমবঙ্গ	৪৭১,৫২৪	৩৫৭,৯৬৯	২২০,২৬৭

বঙ্গ সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রধান কারিগর বামেরা

অভিমন্যু গুহ

পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে? এই প্রশ্ন আজকে বাঙ্গালি করছে। কিন্তু তারা যদি দেশের স্বাধীনতার পরেই এই প্রশ্নটা নিজেদের করতো তাহলে আজ এই প্রশ্ন করার কোনও দরকারই পড়তো না। দেশভাগ- পরবর্তী সেদিনের উদ্বাস্তু-স্রোত শামিল হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ছায়াতলে। সব উদ্বাস্তুরা অবশ্যই নন, তবে তাঁদের মধ্যে সিংহভাগ তো বটেই। কিন্তু পরবর্তী সাতদশকে কী পেলেন তাঁরা? পিতৃপুরুষের ভিটের সঙ্গে তাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল পিতৃপুরুষের সংস্কৃতিও। পরিস্থিতির কিছু বদল আসে ৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর। তার আগে বামেরা সংসদীয় পথে থাকবে না অসংসদীয় পথে হাঁটবে, এনিয়ে সিপিএমের মধ্যেই দুভাগ হয়ে গেছে। অসংসদীয় পথে যারা যেতে চান, তারা সিপিআই (এম এল) গঠন করে বেরিয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগর-রামমোহনের মূর্তি ভাঙার কুকীর্তির পালকও তাদের মুকুটে যুক্ত হয়েছে। ক্ষমতা দখল করার পর মগজ ধোলাইয়ের কল আবার নতুন করে শুরু হলো! ৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে সিপিএম কলকাতার রবীন্দ্রকাননে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন বন্ধ করে দিয়েছিল। এনিয়ে তখন বহু বিতর্ক হয়। ৭৭-এ যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর সিপিএম তাদের এইসব কুকীর্তি ঢাকা দেবার জন্য পূজায় স্টল দেওয়া যেমন শুরু করে তেমনি চটি বইও কিছু ছাপতে আরম্ভ করে। এককালে কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলেছিলেন। সেই সময় কেউ বলেননি এটা ভবানীবাবুর ব্যক্তিগত মত। বরং পার্টির অনুমোদন না থাকলে যে এ ধরনের কথা বলা কখনোই সম্ভব হতো না, সকলেই জানে সেটা। আজ বিপদে পড়ে বামপন্থীরা ভবানীবাবুর ব্যক্তিগত মতের দোহাই দেন।

এছাড়া বিবেকানন্দকে বেকার যুবক বলা, রামকৃষ্ণদেবকে মৃগী রোগী, সিপিআইয়ের সরকারি মুখপত্রে নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলে আক্রমণ কোনও কিছুই বাদ যায়নি। এই অপকীর্তি ঢাকবার জন্যও, আবার মগজধোলাইয়ের যন্ত্র হিসেবেও তারা ছোটো ছোটো পুস্তিকা ছাপতে শুরু করে। পুস্তিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ', রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' ইত্যাদি। অর্থাৎ যেগুলো মোটামুটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে বা গোঁড়া, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে বলা কথাগুলোকে সার্বিকভাবে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুবিধা হয়। মার্কসবাদের মার্কামারা বইগুলির পাশাপাশি এই ধরনের চটি বইগুলি দিয়ে বামপন্থীরা তাদের আদর্শের প্রচার চালাত। তাদের এই প্রচারে বিবেকানন্দ- রামকৃষ্ণ কখনওই প্রচারে আসেননি। এই রাজ্যে হিন্দুত্ব-দর্শনের প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ বামপন্থীদের চটিবইয়ের বিষয় হলেন। আগে বিবেকানন্দ নামটি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কাছে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ঠেলায় পড়ে পার্টি বিবেকানন্দকে একজন সমাজতান্ত্রিক হিসেবে সাজাতে চাইল। সেই মতো বিবেকানন্দের 'মার্কসবাদী দর্শনে'র ওপর কিছু চটি বইও ছাপানো হলো। সিপিএম তাদের এই অ্যাজেন্ডাকে শুধু পার্টিস্তরেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। বাঙ্গালি মনীষীদের নিয়ে চটি বই প্রকাশের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালির মনে জায়গা নেবার অভিলাষ সিপিএমের ছিল। তবে বাঙ্গালির মনে এতে করে জায়গা না পেলেও সংস্কৃতির মূলধারার জায়গাটা তারা দখল করে ফেলল। মনীষীদের নিয়ে সিপিএমের অপকীর্তিও এতে ঢাকা পড়ল, আবার রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যে কমিউনিস্ট পার্টির কত ঘনিষ্ঠ তার গালগল্প প্রচারও হলো।

এই যে আজকে বহিরাগত-তত্ত্ব চলছে, এর মূলেও কমিউনিস্ট পার্টির অবদান সুবিশাল। ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজ্য জুড়ে ব্যানার ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আরএসএস-বিজেপির সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙ্গলার সংস্কৃতি খাপ খায় না। আসলে সিপিএম জানতো, দেশভাগের পরের সত্য এবং তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস চাপা দিয়ে কমিউনিজমের প্রতি যে ঢেউ তোলা হয়েছে, তা বুদবুদের মতোই ক্ষণস্থায়ী। একই সময়ে বড়োলোকের ছেলে- ছোকরাদের কমিউনিজমের স্রোতে গা ভাসানোর যে রেওয়াজ হয়েছিল তাও বেশিদিন টিকল না। সুতরাং বাঙ্গালির সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে আঘাত হানো। তার জেরেই নানারকম পুস্তিকা প্রণয়ন।

বিশেষ করে বাঙ্গলার মনীষীদের নিয়ে নানা বিকৃত বা তাদের আংশিক মত তুলে ধরে কমিউনিস্ট-মতাদর্শের প্রচার। আজ জাগো বাংলার স্টলে মমতা ব্যানার্জির নানারকম বাণী প্রচারের বই আছে দেখে রাজ্যের মানুষ হাসছেন। সিপিএম চালাক ও ধূর্ত। তাই মনীষীদের বাণীর আড়ালে নিজেদের বাণী প্রচার করেছে। অতএব বঙ্গ সংস্কৃতির ধ্বংস শুরু আজ হয়নি, চুয়াল্লিশ বছর আগেই তার সূচনা হয়েছিল, তৃণমূল তাকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র।

(লেখক তরুণ সাংবাদিক এবং গবেষক)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বঞ্চনা থেকেই প্রাথমিক শিক্ষকরা আজ পথে নেমেছেন

জাহ্নবী রায়

গত ছ' বছর ধরে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে। এই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন শিক্ষকরা। যারা দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনকাল থেকে বর্তমানের তৃণমূল পরিচালিত সরকারের কাছেও সবচেয়ে, সবদিক থেকে বঞ্চিতের তালিকায় তাঁরা। বেতন বৈষম্য থেকে শুরু করে যোগ্যতার মাপকাঠি অনুযায়ী বেতন কাঠামো না পাওয়া— সব কিছুই ঘটেছে প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রেই। যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে, তারাই কৌশলে এড়িয়ে গেছে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিষয়টি।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ২৩টি জেলায় প্রায় ৫০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যার মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামীণ এলাকায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষক প্রতি গড়ে তিরিশ জন ছাত্র, সারা ভারতেও তাই। কিন্তু সারা ভারতে যেখানে স্কুল শিক্ষকদের ৭৮.৬৬ শতাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সেখানে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৯৭ শতাংশ স্কুল শিক্ষক পেশাদারি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। কিন্তু এই পেশাদারিত্বের তালিকায় উঠে আসা শিক্ষকরা আজও পাননি যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন কাঠামো। তাঁরা আজও মাদ্রাসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের থেকে অনেকটাই কম বেতন পান। সেই কারণেই তাঁরা যোগ্যতা অনুযায়ী বেতনের অধিকার নিয়ে লড়াই করতে ময়দানে নেমেছেন।

সম্প্রতি রাজ্যে ১৬৫০০ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু যারা যোগ্যতা মান পেরিয়ে ২০১৪ সালে বা তাঁর পরের টেট পরীক্ষার মাধ্যমে সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই বাস্তবে সুযোগ পাননি চাকরির। এবারের পরীক্ষায় তাঁদের আবার ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৃতকার্য হতে পারেননি। এর দায় কে নেবে? তাঁর উত্তর অজানা। যেমন অজানা টেট কেলেংকারির ঘটনায় যোগ্যতরের বঞ্চিত হবার বিষয়টি।

রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে শিক্ষকদের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বাস্তবে সেই সব প্রতিশ্রুতি যে ভোটের আগে দেওয়া ফাঁকা বুলি, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে গত দশ বছরে।

শিক্ষকদের বঞ্চনার বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এনসিটিই-র নিয়ম মেনে শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রাথমিক শিক্ষকতার পেশায় যোগদান করেন। কিন্তু বেতন পাচ্ছিলেন পুরনো হারেই। যেখানে এই রাজ্যের আশেপাশে সব রাজ্যেই প্রাথমিক শিক্ষকদের উন্নত বেতন কাঠামো রয়েছে। বর্তমানে যাঁরা এই পেশায় আসেন তাঁদের কারও যোগ্যতা স্নাতকের নীচে নয় এবং কঠিন প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে আসতে হয়। প্রত্যেকে একটা স্বপ্ন নিয়ে আসেন এবং নিজেদের কেরিয়ার সঠিক ভাবে গড়ে তুলতে চান। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে চলে যাচ্ছেন, যা শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে মোটেও ভালো নয়। যদিও বর্তমানে শিক্ষকদের আন্দোলনের চাপে প্রাথমিক শিক্ষকদের কিছুটা উন্নত বেতন কাঠামো চালু হলেও একরাশ বৈষম্য রেখে দেওয়া হয়েছে। এর ওপর রয়েছে সরকারি নানা সুযোগ না পাবার যন্ত্রণা। যেমন এর মধ্যে আছে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিমা, ইএল, এলটিসি সমেত একগুচ্ছ সরকারি সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবার হতাশা। চরম বঞ্চনা সহ্য করে একপ্রকার বাধ্য হয়েই এই চাকরি করতে হচ্ছে। বদলি নীতিতে রয়েছে স্বজনপোষণ। এর ফলে অনেকের মনোবল ভেঙে যায়। নিয়োগের সময় বিস্তর অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে যা দেখে সমাজের লোকজন প্রাথমিক শিক্ষক- শিক্ষিকাদের ভালো নজরে দেখেন না। যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তারা কোনওরকম সুবিধে পান না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাকর্মী বা

কেয়ার টেকার বা ক্লার্ক না থাকায় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সব কাজ সেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। এক প্রকার মুখ বুজে সব সহ্য করে কাজ চালিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষকরা। আর সেই জায়গা থেকে উঠে আসছে বিতৃষ্ণা।

২৪ জুন ২০১৯। শিক্ষকদের এক আন্দোলন দেখেছিল সারা দেশ। যার অগ্রভাগে ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। তাঁদের দাবি ছিল প্রাথমিকের জন্য যে পিআরটি স্কেল, সেটি তাঁদের দেওয়া হোক। বিশাল জমায়েতকে ছত্রভঙ্গ করতে সেদিন জলকামান, পুলিশের লাঠি পিঠে পড়েছিল ভবিষ্যতের কারিগর তৈরির সেই সম্মাননীয় মাস্টারমশাইদের। যদিও এই সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এই সব প্রাথমিক শিক্ষকদের গায়ে ইতিমধ্যেই লেগে গিয়েছিল 'অযোগ্য' তকমা। সেটা কী কারণে বলেছিলেন তা ক্রমেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ঘুস নিয়ে প্রাথমিকের চাকরির বিষয়টা এখন প্রকাশ্যে এনে ফেলেছেন তাঁর দল থেকে অন্য দলে চলে যাওয়া নেতা বা মন্ত্রীরা। আর কার অঙ্গুলি হেলনে এসব হয়েছে, সেটাও এখন সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ্যে।

(লেখক তরুণ সাংবাদিক)

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2019-2021
8 March - 2021 - Rs. 25.00 Special issue

Published and Printed by Sarada Prasad Paul on behalf of OmSwastik Prakashan Private Limited at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6. Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St, Kolkata-6. Editor : Rantidev Sengupta. || দাম ২৫ টাকা ||